قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

মা'আরিফুল হাদীস

হাদীসে নববীর এক নতুন ও অনুপম সংকলন

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ

চতুর্থ খন্ড

কিতাবুয্ যাকাত, কিতাবুস্ সাওম ও কিতাবুল হজ্জ

সংকলন ঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ

হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস, মাদ্‌রাসা দারুল উলূম

মিরপুর-৬, ঢাকা

চকবাজার ঃ ঢাকা

সংকলকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা এক বিরাট ও প্রকাশ্য মো'জেযা যে, যদিও তিনি উম্মী ছিলেন এবং নিজের নামটি পর্যন্ত লিখতে পারতেন না; কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও পথনির্দেশ এ দুনিয়াতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এ গ্রন্থাগারটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি অংশ তো উহা, যার সম্পর্ক তাঁর আনীত কিতাব কুরআন মজীদের সাথে, যা আসলে আল্লাহ্‌র কালাম— যার শব্দমালাও আসমানী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অন্তঃ নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় অংশটি উহা— যার সম্পর্ক হুযূর (সাঃ)-এর বাণী, দিকনির্দেশনা ও তাঁর পয়গাম্বরী জিন্দেগীর সাথে— যাকে হাদীস বলা হয়।

কুরআন মজীদে গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে শত শত বিদ্যা সৃষ্টি হয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে যে লক্ষ লক্ষ কিতাব লিখা হয়েছে এবং যে বিশাল ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কেবল এ সংক্রান্ত বিষয়েই অস্তিত্বে এসেছে এবং নতুন নতুন সংযোজন হচ্ছে, এখানে আমরা সে ব্যাপারে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু হাদীস সম্পর্কে বলতে চাই যে, এ পর্যন্ত এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিদ্যা সংকলিত হয়েছে এবং এগুলোর উপর যেসব কিতাব লিখা হয়েছে, নিঃসন্দেহে এগুলোর সংখ্যাও লাখের কম নয়।

হাদীসের যে হাজার হাজার সংকলন মুসনাদ, মু'জাম, জামে ও সুনান ইত্যাদির আকারে নববী যুগ থেকে এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে, তারপর এগুলোর রাবীদের জীবনী ও পরিচিতি, তাদের সমালোচনা এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে যে অসংখ্য কিতাব লিখা হয়েছে, তারপর হাদীসের ব্যাখ্যা, শব্দ বিশ্লেষণ এবং এগুলো থেকে মাসআলা উদ্ভাবন এবং এগুলোর হেকমত ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে যেসব গ্রন্থ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন ভাষায় উম্মতের বিশিষ্ট আলেম ও পণ্ডিতগণ লিখেছেন— যেগুলোর মধ্যে সংযোজনের ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। যদি এসব গ্রন্থসমূহ থেকে কেবল একটি একটি কপি একত্রিত করা হয়, তাহলে কোন প্রকার অতিশয়োক্তি ছাড়াই একথা বলা যাবে যে, কোন বিরাট বিল্ডিংও কেবল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট এ ভাণ্ডারের জন্য যথেষ্ট হবে না।

বাস্তব ঘটনা এই যে, হাদীসে নববীর খেদমতের ধারায় প্রতিটি যুগ এবং প্রতিটি অঞ্চলের বিশেষ চাহিদা অনুসারে ইসলামের বিগত তেরশ' বছরে আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের হাদীসের খেদমতগারদের দ্বারা যে কাজ নিয়েছেন এবং যেভাবে নিয়েছেন, এটা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার চরম বিজ্ঞতা ও মহান কুদরতের এক বিশেষ নিদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ নবী হওয়ার এক স্পষ্ট প্রমাণ।

এ মা'আরিফুল হাদীস সিরিজও (যার চতুর্থ খণ্ড এখন আপনার সামনে,) (সংকলকের এলমের দৈন্যতা ও নিজের অবস্থানের কথা বাদ দিলে) নিজস্ব বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ ধারারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ঐ মহান করুণাময় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে ভাষা অক্ষম, যিনি তাঁর এক অযোগ্য ও গুনাহ্‌গার বান্দাকে এ তওফীক ও সৌভাগ্য দান করেছেন যে, সেও হাদীসের খাদেমদের কাতারে শামিল হতে পেরেছে। সুব্‌হানাল্লাহ্! এক দীনহীন বুড়ীরও এ তওফীক হয়েছে যে, সে নিজের সকল সম্বল— হাতে তৈরী কয়েক গাছি সূতা নিয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর খরিদ্দারদের কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। لك الحمد يا ربى

কবির ভাষায় ঃ আমি এক মৃত্তিকাখণ্ড, অনুগ্রহের বারিপাত আমার জীবনে নব বসন্ত এনে দিয়েছে। শত মুখেও যদি এর প্রশংসা করি, তাহলেও তা যথেষ্ট হবে না।

হাদীসে নববীর নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পয়গাম্বরী জীবনের একটি প্রামাণ্য রেকর্ড— যা তাঁর জীবন্ত ব্যক্তিত্বের স্থলাভিষিক্ত। যেসব ঈমানদারগণ এ দুনিয়ার হায়াতে তাঁকে পায়নি, তারা এ হাদীসের ভান্ডারের মাধ্যমে তাঁকে অনেকটা পেতে পারে এবং প্রায় ঐ চিত্ত প্রত্যয়ের সাথে তাঁর হুকুম পালন এবং উসওয়ায়ে হাসানার অনুসরণ করতে পারে, যে চিত্ত প্রত্যয়ের সাথে প্রথম যুগের ভাগ্যবান মু'মিনরা করত— যারা ঈমানের সাথে তাঁকে এ জীবনেই পেয়ে গিয়েছিল।

এ "মা'আরিফুল হাদীস" সকংলনের আসল উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের যেসব ভাই হাদীসের মূল কিতাব পাঠ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবন এবং তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে ঐ অবগতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না— যা হাদীসগ্রন্থ থেকেই লাভ করা সম্ভব এবং এ পথে নবীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তাদের জন্যও যেন রাস্তা খুলে যায় এবং তারাও যেন এ মহান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়।

আশা করি, যেসব ঈমানদার বান্দা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বত ও শ্রেষ্ঠত্বকে অন্তরে জাগ্রত করে খাঁটি অনুসন্ধিৎসা ও আদবের সাথে এ সিরিজ পাঠ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ তাদের ভাগ্যে এ দৌলত নসীব হবে এবং হাদীসের বিশেষ নূর ও বরকত থেকে তারাও অংশ পাবে। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক বিশেষ নৈকট্য ও সংযোগ সম্পর্ক অনুভব করবে।

মা'আরিফুল হাদীসের পাঠকদের জানা আছে যে, এ কিতাবটির ধরন এই নয় যে, হাদীসের কোন একটি কিতাব সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে এবং ব্যাখ্যাসহ এর অনুবাদ করে যাওয়া হচ্ছে; বরং এর সংকলনে এ ধারা ও রীতি অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রথমে বিষয়বস্তু ও অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশাল হাদীস ভাণ্ডার অনুসন্ধান করে ঐসব হাদীস নির্বাচন করা হয়, যেগুলো উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা উপযোগী মনে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এগুলো বিন্যাস করা হয় এবং এগুলোর অনুবাদ ও প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যায় কিছু লিখা হয়। অধিকাংশ সময় প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে বর্তমান যুগের বিশেষ চিন্তা-প্রবণতাকে সামনে রেখে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর রীতি অনুযায়ী এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা ও হেদায়াতের হেকমত, রহস্য ও উপযোগিতার উপরও কিছু আলোকপাত করা হয়। এ পুরো কাজটিতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাই

থাকে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়াত ও শিক্ষা এবং তাঁর পয়গাম্বরী জিন্দেগীর চিত্রটি যেন এভাবে সামনে এসে যায় যে, এটা যে স্বভাবধর্মের অনুকূল, সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর, এ বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে যায় এবং পাঠকদের অন্তরে ঈমানের নূর, প্রশান্তি ও আমলের আগ্রহও জন্ম নেয়।

এ সিরিজের তিনটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঈমান ও আখেরাত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আখলাক-নৈতিকতা ও রেকাক সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলন করে পেশ করা হয়েছিল। তৃতীয় খণ্ডে ত্বাহারাত অধ্যায় এবং এবাদত চতুষ্টয় (নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ একত্রিত করে পাঠকদের কাছে পেশ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কলেবর খুব বেশী বড় হয়ে যাওয়ার কারণে এ খণ্ডটি নামায অধ্যায় পর্যন্তই শেষ করে দিতে হয়েছে। বাকী অংশ (অর্থাৎ, কিতাবুয্ যাকাত, কিতাবুস্ সাওম ও কিতাবুল হজ্জ) এ চতুর্থ খণ্ডে পেশ করা হচ্ছে।

দুনিয়াতে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, তারা মানুষকে তাদের মালিক ও প্রতিপালকের সাথে পরিচিত করে দিবেন এবং তাঁর দাসত্বের অনুশীলনকারী বানিয়ে দিবেন— যা হচ্ছে তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ এ জন্য তাঁরা ঈমান ও তওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে আল্লাহ্র এবাদতের প্রতি আহ্বান করতেন। মানুষের আমলসমূহের মধ্যে এবাদতেরই এ বৈশিষ্ট্য যে, এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও আনুগত্যের বিষয়টি প্রকাশ করে এবং এগুলোর প্রভাবে তার জীবন দাসত্বের রঙে রঞ্জিত হয়। তাছাড়া এবাদতের মাধ্যমেই ঊর্ধ্ব জগতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হয় এবং এতে অব্যাহত উন্নতি হতে থাকে। এ জন্যই আসমানী শরীঅতগুলোর মধ্যে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য হুকুম ও দাবী এবাদতেরই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের পর নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জকে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ চারটিই হচ্ছে মৌলিক এবাদত এবং মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অনেক কিছুই নির্ভর করে এই চারটি জিনিসের উপর।

এ আরকান চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়াত ও শিক্ষা এবং তাঁর অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কীয় হাদীসগুলো তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করে আসা হয়েছে। অবশিষ্ট আরকানত্রয় (যাকাত, রোযা ও হজ্জ) সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এ খণ্ডে পেশ করা হচ্ছে। আগে ধারণা ছিল যে, যিকির ও দো'আ সম্পর্কীয় হাদীসগুলোও এ খণ্ডে এসে যাবে; কিন্তু যখন ঐগুলো একত্রিত করা হল, তখন অনুমান করলাম যে, ঐগুলো একটি পৃথক খণ্ডেই কেবল আসতে পারে। তাই পরবর্তী ৫ম খণ্ডটি 'কিতাবুল আয্কার ওয়াদ্ দাওয়াত' শিরোনামেই হবে ইন্শাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা তওফীক দান করুন, যেন এটা প্রস্তুত করতে ও প্রকাশ করতে বেশী দেরী না হয়।

এ চতুর্থ খণ্ডের হাদীসগুলোও প্রথম তিন খণ্ডের মত অধিকতর মেশকাত শরীফ অথবা জমউল ফাওয়ায়েদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বরাতের বেলায় এগুলোর উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মেশকাত প্রণেতার নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে যে, বরাত উল্লেখের ক্ষেত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ অথবা এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির বরাত উল্লেখ

করার পর অন্য কোন কিতাবের বরাত উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, এগুলোর বরাত উল্লেখ করার পর অন্য কোন কিতাবের বরাত দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কোন কোন হাদীস কানযুল উম্মাল থেকেও নেওয়া হয়েছে এবং কিছু হাদীস সরাসরি ছেহাহ্ সিত্তা অর্থাৎ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ থেকেও নেওয়া হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে ঐসব হাদীস, যেগুলো এ শব্দমালায় মেশকাত শরীফ অথবা জমউল ফাওয়ায়েদে উল্লেখিত হয়নি।

পাঠকদের খেদমতে শেষ নিবেদন

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত লাভের নিয়্যতে। তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে। হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্ নগদে লাভ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন।

সকলের দো'আ প্রার্থী অধম ও গুনাহ্গার বান্দা
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী
২২শে জুমাদাল উখরা ১৩৭৩ হিজরী
মোতাবেক ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং

সূচী-পত্র

✪✪✪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও এর অবস্থান

এটা এক সুবিদিত সত্য যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান ও নামায কায়েমের পর যাকাত হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় রোকন ও খুঁটি। কুরআন মজীদে সত্তরের অধিক জায়গায় নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ একই সাথে এভাবে করা হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলামে এ উভয়টির স্থান ও মর্যাদা প্রায় একই। এ জন্যই যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোন কোন্ অঞ্চলের এমন কিছু লোক— যারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তওহীদ ও রেসালতের স্বীকৃতিসহ নামাযও পড়ত— যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এ ভিত্তিতেই করেছিলেন যে, এরা নামায ও যাকাতের বিধানে পার্থক্য সৃষ্টি করে— যা আল্লাহ্ ও রাসূলের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তথা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ বর্ণনা যে, অভিমত প্রকাশের বেলায় হযরত ওমর (রাযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ *

অর্থাৎ, আল্লাহ্র কসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। তারপর সকল সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নিলেন এবং এর উপর ইজমা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এ মা'আরিফুল হাদীস সিরিজের প্রথম খণ্ডের একেবারে শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে তিনি ইসলামের আরকান এবং মৌলিক বিধান ও দাবীসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে তওহীদ ও রেসালতের পর নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

যাহোক, কুরআন পাক এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও বক্তব্যে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের আলোচনাটি সাধারণত এভাবে একসাথে করা হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলামে এ দু'টির স্থান প্রায় একই এবং এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

যাকাতের তিনটি দিক

যাকাতের মধ্যে পুণ্য ও উপকারিতার তিনটি দিক রয়েছে। (১) মু'মিন বান্দা যেভাবে নামাযের কেয়াম, রুকূ ও সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব, দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ দেহ, মন ও মুখ দ্বারা করে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি, রহমত ও তাঁর

নৈকট্য সে লাভ করতে পারে, তেমনিভাবে যাকাত আদায় করে সে ঐ দরবারে নিজের আর্থিক নজরানা এ উদ্দেশ্যেই পেশ করে। এভাবে সে একথার বাস্তব প্রমাণ দেয় যে, তার কাছে যাকিছু আছে সে এটাকে নিজের মনে করে না; বরং আল্লাহ্‌র মনে করে এবং আল্লাহ্‌র বলেই বিশ্বাস করে। সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য এটা উৎসর্গ করে দেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেয়। এ দিক দিয়েই যাকাতকে এবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয়। দ্বীন ও শরীঅতের বিশেষ পরিভাষায় 'এবাদত' বান্দার ঐসব আমলকেই বলা হয়, যেগুলোর পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও বন্দেগীর সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে তাঁর কৃপা-অনুগ্রহ এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করা। (২) যাকাতের মধ্যে দ্বিতীয় দিকটি এই যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অভাবী ও দুস্থ বান্দাদের সেবা ও সাহায্য-সহযোগিতা হয়। এ দিক থেকে যাকাত নৈতিকতার এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। (৩) যাকাতের তৃতীয় উপকারিতার দিকটি এই যে, অর্থের মোহ এবং সম্পদপূজা যা একটি ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক রোগ, যাকাত হচ্ছে এর চিকিৎসা এবং এর মন্দ ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে আত্মার পরিশুদ্ধির বিরাট মাধ্যম। এ জন্যই কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا অর্থাৎ, হে নবী! আপনি মুসলমানদের সম্পদ থেকে সদাকা (যাকাত) উসুল করুন, যার দ্বারা তাদের অন্তর পবিত্র ও আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। (সূরা তওবা)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىۙ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰىۚ অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন থেকে ঐসব মুত্তাকীদেরকে দূরে রাখা হবে, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে এ জন্য দান করে— যাতে তাদের আত্মা ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। (সূরা ওয়াল লাইল) বরং বলা যায় যে, যাকাতের নাম এ দিকে লক্ষ্য করেই সম্ভবত যাকাত রাখা হয়েছে যে, এর দ্বারা একই সাথে অন্তরে ও ধন-সম্পদে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা আসে। কেননা, যাকাতের আসল অর্থই হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি।

যাকাতের বিধান ঃ পূর্ববর্তী শরীঅতসমূহে

যাকাতের এ অসাধারণ গুরুত্ব ও উপকারিতার কারণে এর নির্দেশ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের শরীঅতেও নামাযের সাথে সাথেই ছিল। সূরা আম্বিয়ায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসহাক (আঃ) এবং তারপর তাঁর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَۙ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আদেশ দিলাম পুণ্য কাজের, (বিশেষ করে) নামায কায়েমের এবং যাকাত আদায়ের। আর তারা আমার এবাদতগুযার বান্দা ছিল। (সূরা আম্বিয়া ঃ রুকূ-৫) সূরা মারয়ামে হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص অর্থাৎ, তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। (সূরা মারয়াম ঃ রুকূ-৪) ইসরাঈল ধারার শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝ وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِيْ

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۝

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি সেখানেই তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আর যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি, আমাকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন। সূরা বাক্বারায় যেখানে বনী ইসরাঈলের ঈমানী অঙ্গীকার এবং ঐসব মৌলিক বিধি-বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পালন করার প্রতিজ্ঞা তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে একটি নির্দেশ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ । অর্থাৎ, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সূরা মা-ইদাহ্‌র যেখানে বনী ইসরাঈলের এ প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমি (আমার সাহায্যসহ) তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন ....।

কুরআন মজীদের এসব আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নামায ও যাকাত সব সময়ই আসমানী শরীঅতসমূহের বিশেষ রোকন ও প্রতীক পরিগণিত হয়ে আসছে। হ্যাঁ, ঐগুলোর রূপরেখা ও বিস্তারিত বিধান এবং পরিমাণ নির্ধারণে পার্থক্য ছিল। আর এ পার্থক্য তো স্বয়ং আমাদের শরীঅতেরও প্রাথমিক এবং শেষ ও পরিপূর্ণতার যুগে ছিল। উদাহরণতঃ, নামায প্রথমে তিন ওয়াক্ত ছিল, পরে পাঁচ ওয়াক্ত হয়েছে। তেমনিভাবে প্রথমে ফরয নামায কেবল দু' রাকআত পড়া হত, পরে ফজর ছাড়া অন্য চার ওয়াক্তে রাকআত সংখ্যা বেড়ে গেল। প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে সালাম-কালামের অবকাশ ছিল, তারপর এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অনুরূপভাবে হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই যাকাতের হুকুম ছিল। (যেমন, সূরা মু'মিনূন, সূরা নাম্‌ল ও সূরা লোকমানের একেবারে শুরুর আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের অপরিহার্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে নামায কায়েম এবং যাকাত আদায়ের উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে, অথচ এ তিনটি সূরাই মক্কী যুগের।) কিন্তু ঐ যুগে যাকাতের অর্থ কেবল এ ছিল যে, আল্লাহ্‌র অভাবী বান্দাদের উপর এবং অন্যান্য কল্যাণ কাজে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা হবে। যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত বিধান ঐ সময় আসে নাই, সেটা হিজরতের পর মদীনায় এসেছে। অতএব, যেসব ঐতিহাসিক ও লিখক একথা লিখেছেন যে, যাকাতের হুকুম হিজরতের পর দ্বিতীয় সালে অথবা এরও পরে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই যে, এর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা, পরিমাণ ও বিস্তারিত বিধি-বিধান তখন নাযিল হয়েছে। অন্যথায় যাকাতের সাধারণ হুকুম তো ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরতের বেশ পূর্বেই এসে গিয়েছিল।

এ বিষয়টি কুরআন মজীদের উপরে উল্লেখিত মক্কী সূরাসমূহের ঐসব আয়াত ছাড়াও— যেগুলোর দিকে এ মাত্র ইশারা করা হয়েছে— হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)-এর ঐ বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়, যেখানে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত

জাফর তাইয়ার (রাযিঃ)-এর ঐ কথোপকথনের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দেন। আর একথা সবারই জানা যে, হযরত জাফর তাইয়ার ও তাঁর সাথীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরত করার বহু পূর্বে— ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্যের বর্ণনা অনুযায়ী রোম সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে (ঐ সময়কার তাঁর কঠিন শত্রু) আবূ সুফিয়ানের এ বর্ণনা ঃ يَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ (তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত, আত্মীয়তার বন্ধন ও সাধুতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন।) একথার স্পষ্ট দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় অবস্থান কালেও নামায ও যাকাতের দাওয়াত দিতেন। হ্যাঁ, যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত মাসআলা মাসায়েল এবং এর রূপরেখা ও পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি হিজরতের পরে এসেছে। আর কেন্দ্রীয়ভাবে তা উসূল করার ব্যবস্থা তো ৮ম হিজরীর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ভূমিকার পর এখন যাকাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহ পাঠ করে নিন ঃ

ঈমান ও নামাযের পর যাকাতের দাওয়াত

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ * (رواه البخارى ومسلم)

১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মো'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি (তাকে বিদায় জানানোর সময়) বললেন, তুমি সেখানে যখন আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে (সর্বপ্রথম) এ কথার সাক্ষ্যদানের দিকে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর সদাকা (অর্থাৎ, যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন— যা তাদের বিত্তবানদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। তারপর তারা যদি এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে (এই যাকাত উসূল করার সময় বেছে বেছে)

তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে; (বরং মধ্যম মানের মাল গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে কারো প্রতি বাড়াবাড়ি ও অবিচার করবে না।) আর মযলূমের বদদো'আকে ভয় করবে। কেননা, এর মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা বা অন্তরায় নেই। (এটা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে যায় এবং কবুল হয়ে যায়।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি যদিও মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খন্ডে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সেখানে এর ব্যাখ্যাও বিস্তারিতভাবে করে আসা হয়েছে, তবুও ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসদের রীতি অনুযায়ী এটাই সমীচীন মনে করা হয়েছে যে, কিতাবুয যাকাতের সূচনা এ হাদীস দিয়েই করা হোক।

হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামনের শাসক ও বিচারক বানিয়ে পাঠানোর এ ঘটনাটি অধিকাংশ আলেম ও সীরাতবিদদের অনুসন্ধান অনুসারে হিজরী নবম সনের। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কিছু আলেমের মতে এটা দশম হিজরীর ঘটনা। ইয়ামন দেশে যদিও আহ্লে কিতাব ছাড়া মূর্তিপূজারী জনগোষ্ঠীও ছিল; কিন্তু আহলে কিতাবের বিশেষ গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে ইসলামের প্রতি দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের এ প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান ও এর দাবীসমূহ এক সাথে যেন লোকদের সামনে পেশ না করা হয়। কেননা, এ অবস্থায় ইসলাম তাদের কাছে খুব কঠিন ও দুর্বহ বোঝা মনে হবে। এ জন্য প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের আকীদাগত ভিত্তি কেবল তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দানকে রাখা হবে— যা প্রতিটি যুক্তি অনুসারী, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও পবিত্র অন্তরের মানুষ সহজে মেনে নিতে রাজী হয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের জন্য এটা সুবিদিত বিষয়। তারপর যখন শ্রোতার মন-মস্তিষ্ক এটা গ্রহণ করে নিবে এবং সে এ সহজাত ও মৌলিক বিষয়টি মেনে নিবে, তখন তার সামনে নামাযের বিধানটি রাখতে হবে— যা দৈহিক ও মৌখিক এবাদতের একটি অতি সুন্দর ও উত্তম সামষ্টিক রূপ। তারপর সে যখন এটা গ্রহণ করে নিবে, তখন তার সামনে যাকাতের বিধানটি রাখা হবে এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে এ কথাটি স্পষ্ট করে দিবে যে, এ যাকাত ও সদাকা ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী ও এর প্রচারক তোমাদের নিকট থেকে তার নিজের জন্য দাবী করে না; বরং একটি নির্ধারিত হিসাব ও নিয়ম অনুযায়ী যে এলাকার বিত্তবানদের থেকে এটা গ্রহণ করা হবে, ঐ এলাকার দুস্থ ও গরীবদের মধ্যেই এটা বন্টন করে দেওয়া হবে। ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এ দিকনির্দেশনার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযকে এ তাকীদও করেছেন যে, যাকাত উসূল করতে গিয়ে পূর্ণ ইনসাফের সাথে কাজ নিতে হবে, তাদের গবাদি পশু এবং তাদের উৎপন্ন ফসল থেকে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া যাবে না।

সবশেষে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি একটি অঞ্চলের শাসক ও গভর্নর হয়ে যাচ্ছ। তাই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে খুবই সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ্র কোন মজলূম বান্দা যখন জালেমের বিরুদ্ধে বদদো'আ করে, তখন এটা সোজা আল্লাহ্র আরশে পৌঁছে যায়। কবি বলেন ঃ মজলূমের বদদো'আ ও ফরিয়াদকে ভয় কর। কেননা, সে যখন দো'আ করে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর জবাব তাকে স্বাগত জানাতে আসে।

এ হাদীসে ইসলামের দাওয়াতের বেলায় কেবল তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান, নামায ও যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান এমনকি রোযা ও হজ্জের কথাও উল্লেখ করা হয়নি— যেগুলো নামায ও যাকাতের মতই ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হযরত মো'আয (রাযিঃ)কে যে সময় ইয়ামন প্রেরণ করা হয়, তখন রোযা ও হজ্জের বিধান ফরয হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার মূলনীতি এবং এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতির শিক্ষা দান। এ জন্য তিনি কেবল এ তিনটি বুনিয়াদের উল্লেখ করেছেন। যদি ইসলামের সকল বুনিয়াদের শিক্ষা দান তাঁর উদ্দেশ্য হত, তাহলে তিনি একই সাথে সব বুনিয়াদের কথাই উল্লেখ করতেন। কিন্তু হযরত মো'আযকে এটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তিনি ঐসব সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম, যারা এলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

যাকাত আদায় না করার শাস্তি

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ (يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ) ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الاية * (رواه البخارى)

২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারপরও সে এর যাকাত আদায় করল না, কেয়ামতের দিন তার এ মালকে এমন বিষধর সাপের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে, বিষের দরুণ যার মাথার চুল পড়ে গিয়েছে এবং তার চোখের উপর দু'টি সাদা দাগ রয়েছে। (বিশেষ আকৃতির এ সাপ সবচেয়ে বেশী বিষধর।) তারপর এ সাপকে তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সে ঐ মালদারের চোয়ালে দংশন করবে এবং বলতে থাকবে, " আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করে। সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। —বুখারী

(তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফেও এ বিষয়বস্তুটি শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসে বিশেষ বিশেষ আমলের যে বিশেষ প্রতিদান ও বিশেষ শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এসব আমল এবং প্রতিদান ও শাস্তির মধ্যে সর্বদাই বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে। অনেক সময় এ সম্পর্কটি এমন স্পষ্ট হয়, যা বুঝা আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্যও কোন কঠিন ব্যাপার হয় না। আর কখনো কখনো এমন সূক্ষ্ম ও গোপন সম্পর্ক থাকে, যা উম্মতের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীরাই বুঝতে পারেন। এ হাদীসে যাকাত আদায় না করার গুনাহের যে বিশেষ শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, এ সম্পদ এক বিষাক্ত সাপের আকৃতিতে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং তার দুই চোয়ালে দংশন করবে, নিঃসন্দেহে এ গুনাহ এবং এর শাস্তির মধ্যেও একটা বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। এটা ঐ সম্পর্কই, যার কারণে ঐ কৃপণ মানুষকে— যে সম্পদের মোহের কারণে নিজের সম্পদকে আঁকড়ে থাকে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও খরচ করে না— বলা হয় যে, সে নিজের সম্পদ ও ভান্ডারে সাপ হয়ে বসে আছে। আর এ সম্পর্কের কারণেই কৃপণ ও ক্ষুদ্রমনা মানুষ কখনো কখনো এ ধরনের স্বপ্নও দেখে থাকে।

এ হাদীসে এবং উপরে উল্লেখিত সূরা আলে এমরানের আয়াতে 'কেয়ামতের দিন' বলে যে শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আযাবটি জাহান্নাম অথবা জান্নাতের ফায়সালার পূর্বে হাশরের ময়দানে হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক হাদীসে যারা যাকাত আদায় করে না, এ ধরনের এক বিশেষ স্তরের মানুষের বিশেষ আযাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শেষে বলা হয়েছে ঃ

حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلَهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ–

(এ শাস্তি ঐ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বান্দাদের হিসাব-কিতাবের পর তাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।) ঐ সিদ্ধান্ত ও ভাগ্য নির্ধারণের পর এ ব্যক্তি হয়তো জান্নাতের পথ দেখবে অথবা জাহান্নামের পথ। অর্থাৎ, যে পরিমাণ শাস্তি সে হিসাব-নিকাশ ও শেষ ফায়সালার আগে ভোগ করে নিবে, তার পাপের শাস্তি হিসাবে যদি এতটুকুই আল্লাহ্‌র নিকট যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তাহলে এরপর সে ছুটি ও মুক্তি পেয়ে যাবে এবং তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি হাশরের ময়দানের এ আযাব দ্বারা সে দায়মুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত শাস্তির জন্য তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا وَاغْفِرْلَنَا وَلَاتُعَذِّبْنَا

কেয়ামত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের শাস্তি ও আরাম সম্পর্কে যে মৌলিক কথাগুলো মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খন্ডে লিখা হয়েছে, ঐ কথাগুলো যাদের নজরে আসেনি তারা যেন এগুলো অবশ্যই দেখে নেন। এসব বিষয় সম্পর্কে যে সব খটকা ও সংশয় অনেকের মনে সৃষ্টি হয়, এটা পাঠ করে নিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এর নিরসন হয়ে যাবে।

(٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ * (رواه الشافعى والبخارى فى تاريخه والحميدى فى مسنده)

৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাকাতের মাল যখন অন্য মালের সাথে মিশে যায়, তখন এটা ঐ মালকে ধ্বংস করে দেয়। —মুসনাদে শাফেয়ী, তারীখে বুখারী, মুসনাদে হুমায়দী

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম হুমায়দী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করে এর অর্থ এ বর্ণনা করেছেন যে, কারো উপর যদি যাকাত ওয়াজিব হয় আর সে এটা আদায় না করে, তাহলে বে-বরকতীর কারণে তার অবশিষ্ট মালও ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলতেন, এ হাদীসটির মর্ম ও প্রয়োগস্থল এই যে, যদি কোন ধনী ব্যক্তি (যে যাকাতের হকদার নয়,) ভুল পন্থায় যাকাত গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এ যাকাত তার অন্য মালের সাথে মিশে গিয়ে এটাকে ধ্বংস করে ফেলবে। সংকলকের ধারণায় হাদীসের শব্দমালায় এ উভয় ব্যাখ্যারই অবকাশ রয়েছে এবং এ দু'টির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

যাকাত মালকে পবিত্র করে

(٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الاية كَبُرَ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطِيْبَ مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ * (رواه ابوداؤد)

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (সূরা তওবার) এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (অর্থাৎ, যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং এটা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।) তখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে এটা খুবই ভারী বোধ হল (এবং তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।) হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে উদ্বেগমুক্ত করার চেষ্টা করব। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আপনার সাহাবীদের উপর এ আয়াতটি খুবই ভারী মনে হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক তো যাকাত এজন্যই ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মাল পাক-পবিত্র হয়ে যায়। (অনুরূপভাবে) তিনি উত্তরাধিকারের আইনও এজন্য দিয়েছেন, যাতে তোমাদের পরবর্তীদের জন্য এটা ভরসাস্থল হয়। হযরত ওমর (একথা শুনে আনন্দে) বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলে দিব যে, একজন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চয় কি হতে পারে ? সেটা হচ্ছে ঐ পুণ্যবতী স্ত্রী, যাকে দেখলে স্বামীর মন খুশী হয়, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদসহ সকল আমানতের হেফাযত করে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ সূরা তওবার যে আয়াতটির উল্লেখ এ হাদীসে এসেছে, সেই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এর বাহ্যিক শব্দমালা ও কথার ভঙ্গিতে এই মনে করলেন যে, এর মর্ম ও দাবী এটাই যে, নিজের উপার্জনের মধ্য থেকে কোন কিছুই সঞ্চয় করে রাখা যাবে না এবং সম্পদ একেবারেই জমা করা যাবে না— সম্পদ যাই হাতে আসবে, তাই আল্লাহ্র পথে খরচ করে দিতে হবে। আর একথা স্পষ্ট যে, এ বিষয়টি মানুষের জন্য খুবই কঠিন। হযরত ওমর (রাযিঃ) সাহস করলেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রশ্ন করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন যে ঃ এ আয়াতটির সম্পর্ক ঐসব লোকের সাথে, যারা অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং এর যাকাত আদায় করে না। কিন্তু যদি যাকাত আদায় করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশিষ্ট মাল হালাল ও পবিত্র হয়ে যায়। তিনি এখানে এ কথাও বলে দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত এজন্যই ফরয করেছেন— যাতে এটা আদায় করে দিলে অবশিষ্ট মাল পাক হয়ে যায়। তারপর তিনি আরেকটি কথা অতিরিক্ত বলে দিলেন যে, এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরাধিকার আইনও এজন্য করে দিয়েছেন— যাতে কোন মানুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া লোকদের জন্য একটি আশ্রয় হয়। এ উত্তরের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইঙ্গিতও করে দিলেন যে, যদি সঞ্চয় করা এবং অর্থ-সম্পদ জমা করা একেবারেই নিষেধ হত, তাহলে শরীঅতে যাকাত এবং উত্তরাধিকারের বিধানই থাকত না। কেননা, শরীঅতের এ দু'টি বিধানের সম্পর্ক সঞ্চিত সম্পদের সাথে। যদি অর্থ-সম্পদ জমা রাখার একেবারেই অনুমতি না থাকে, তাহলে যাকাত ও উত্তরাধিকার বন্টনের প্রশ্নই আসবে না।

হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর আসল প্রশ্নের এ উত্তর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সুস্থ মন-মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে একটি অতিরিক্ত কথা এও বলে দিলেন যে, অর্থ-সম্পদের চেয়ে বেশী কাজের জিনিস— যা এ দুনিয়াতে অন্তরের প্রশান্তি ও আত্মার তৃপ্তির সবচেয়ে বড় পুঁজি— সেটা হচ্ছে পুণ্যবতী ও অনুগত জীবনসঙ্গিনী। তার মূল্যায়ন অর্থ-সম্পদের চেয়েও বেশী করতে হবে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নে'আমত মনে করবে। এ কথাটি তিনি এক্ষেত্রে এ জন্য বলেছেন যে, ঐ যুগে মহিলাদেরকে খুবই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হত এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হত।

যাকাতের বিস্তারিত বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি

যাকাতের সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক স্বরূপ তো এটাই যে, নিজের সম্পদ ও নিজের উপার্জন থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কিছু ব্যয় করা হবে। একটু আগেই যেমন বলা হয়েছে যে, ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশই ছিল। পরে এর বিস্তারিত বিধান এসেছে এবং নিয়ম-নীতি নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, কোন্ প্রকার সম্পদে যাকাত আসবে, কমপক্ষে কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে, কত সময় পার হওয়ার পর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং কোন্ কোন্ খাতে এটা খরচ করা যাবে ইত্যাদি। এবার ঐ হাদীসগুলো পাঠ করে নিন, যেগুলোর মধ্যে যাকাতের বিস্তারিত বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

কমপক্ষে কতটুকু সম্পদ হলে যাকাত ফরয হয়

(৫) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ

اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়্যার কম রূপায় যাকাত নেই এবং পাঁচ সংখ্যকের কম উটে যাকাত নেই। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ নববী যুগে বিশেষ করে মদীনার আশেপাশে যারা ধনী ও অবস্থাসম্পন্ন ছিল, তাদের কাছে সম্পদ সাধারণতঃ তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার থাকত। হয়তো তাদের বাগানের উৎপাদিত ফসল খেজুরের আকারে, অথবা রূপার আকারে কিংবা উটের আকারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ তিন প্রকার সম্পদেরই যাকাতের নেসাব বলে দিয়েছেন, অর্থাৎ, এসব জিনিসের কমপক্ষে কি পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হবে। খেজুরের বেলায় তিনি বলে দিয়েছেন যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এক ওয়াসাক প্রায় ৬ মণের সমান হয়। এ হিসাবে ৫ ওয়াসাক খেজুর প্রায় ৩০ মণ হবে। রূপার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, ৫ উকিয়্যার কম হলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এক উকিয়্যা রূপা ৪০ দেরহামের সমান হয়। এ হিসাবে ৫ উকিয়্যা ২০০ দেরহামের সমান হবে— যার ওজন প্রসিদ্ধ মত হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয়। উটের ব্যাপারে তিনি বলে দিয়েছেন যে, সংখ্যায় পাঁচের কম হলে এতে যাকাত আসবে না। এ হাদীসে কেবল এ তিনটি জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন যে, ৫ ওয়াসাক (৩০ মণ) খেজুর একটি ছোট পরিবারের সারা বছরের সংসার চলার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। তদ্রূপভাবে ২০০ দেরহামে সারা বছরের খরচ চলতে পারত, আর মূল্যমান বিবেচনায় ৫টি উট প্রায় এরই সমান হত। এ জন্য এ পরিমাণ সম্পদের মালিককে অবস্থাসম্পন্ন ও সম্পদশালী ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে।

(٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيْ تِسْعَةٍ وَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ * (رواه الترمذى ابوداؤد)

৬। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত মাফ করে দিলাম। অতএব, তোমরা রূপার যাকাত আদায় কর প্রতি চল্লিশ দেরহাম থেকে এক দেরহাম। আর ১৯৯ পর্যন্ত কোন যাকাত নেই। তবে যখন ২০০ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এতে পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে। —তিরমিযী, আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ ঘোড়া ও গোলাম যদি কারো কাছে ব্যবসার জন্য থাকে, তাহলে হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ)-এর সামনের হাদীস অনুযায়ী এগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।

তবে যদি ব্যবসার জন্য না হয়; বরং বাহন ও খেদমতের জন্য হয়, তাহলে এগুলোর মূল্য যাই হোক না কেন, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। হযরত আলী (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে গোলাম ও ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক এ অবস্থার সাথেই। সামনে রূপা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত কারো কাছে পূর্ণ দু'শ দেরহাম পরিমাণ রূপা না হবে, সে পর্যন্ত এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর দু'শ দেরহাম পরিমাণ হয়ে গেলে ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসাবে পাঁচ দেরহাম আদায় করতে হবে।

ব্যবসার মালের উপর যাকাত

(٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ٭ (رواه ابوداؤد)

৭। হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন ঐ মালের যাকাত আদায় করে দেই, যা বিক্রির জন্য আমরা প্রস্তুত করে রাখি। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ যে মালেরই ব্যবসা করবে, এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে

(٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكٰوةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ٭ (رواه الترمذى)

৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন মাল হস্তগত হল, বর্ষপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। —তিরমিযী।

অলংকারাদির যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهَا فِىْ يَدِ ابْنَتِهَا مُسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا ؟ قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سِوَارَيْنِ مِنَ النَّارِ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ٭ (رواه ابوداؤد وغيره من اصحاب السنن)

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা তার এক মেয়েকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসল। তার মেয়েটির হাতে দু'টি মোটা ও ভারী চুড়ি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি এর যাকাত আদায় কর ? উত্তরে সে বলল, না। তিনি তখন বললেন ঃ তোমার কি এটা ভাল লাগবে যে, এ দু'টির (যাকাত আদায় না করার) কারণে আল্লাহ্

তা'আলা কেয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দু'টি চুড়ি পরিয়ে দেন ? এ কথা শুনে সে চুড়ি দু'টি খুলে ফেলল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দিয়ে বলল, এগুলো এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

(١٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدّٰى زَكٰوتُهٗ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ٭ (رواه مالك وابوداؤد)

১০। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনার আওযাহ (এক বিশেষ ধরনের বালা) পরতাম। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি কান্যের অন্তর্ভুক্ত ? (যার উপর জাহান্নামের আযাবের ধমকি এসেছে।) তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে মাল যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর এর যাকাত আদায় করে দেওয়া হয়, এটা কান্য (অন্যায় সঞ্চয় নয়।) —মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীসের ভিত্তিতেই ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন যে, সোনা-রূপার অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে এগুলোর যাকাত দিতে হবে। তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট অলংকারাদিতে যাকাত কেবল তখনই ফরয— যখন এগুলো ব্যবসার জন্য রাখা হয় অথবা মালকে সংরক্ষণ করার জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব অলংকার কেবল ব্যবহার ও সাজ-সজ্জার জন্য থাকে, এ তিন ইমামের মতে এগুলোর উপর যাকাত নেই।

এ মাসআলাটিতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। তবে হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতের সপক্ষেই বেশী সমর্থন পাওয়া যায়। এ জন্যই শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ আলেমগণও এ মাসআলায় হানাফী মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন, তফসীরে কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এ নীতিই অবলম্বন করেছেন এবং লিখেছেন যে, প্রকাশ্য দলীলসমূহ এ মতকেই অধিক শক্তি যোগায়।

যাকাত অগ্রিমও আদায় করা যায়

(١١) عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِيْ ذَالِكَ ٭ (رواه ابوداؤد والترمذى وابن ماجه والدارمى)

১১। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আব্বাস (রাযিঃ) সময় হওয়ার পূর্বেই তার যাকাত অগ্রিম আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তখন তাকে এর অনুমতি দিয়ে দিলেন। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী।

যাকাত-সদাকার হকদার কারা

(١٢) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيْ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهٗ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ

لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ * (رواه ابوداؤد)

১২। হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। তারপর যিয়াদ একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন (এবং এ প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ করলেন যে,) এক ব্যক্তি এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, যাকাতের মাল থেকে আমাকে কিছু দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের হকদার কারা হবে, এ বিষয়টির ফায়সালা কোন নবী অথবা অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেননি; বরং নিজেই এর ফায়সালা করে দিয়েছেন এবং এটাকে আট প্রকার লোকের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অতএব, তুমি যদি ঐ আট প্রকারের মধ্য থেকে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমি তোমাকে যাকাত থেকে অংশ দিব। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার যে হুকুমের বরাত দিয়েছেন সেটা সূরা তওবার এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط

অর্থাৎ, যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের মন যোগানো প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। (সূরা তওবা ঃ রুকূ ৮)

এ হচ্ছে যাকাতের ৮টি ব্যয়খাত, যা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই ঃ (১) ফকীর— অর্থাৎ, সাধারণ গরীব ও বিত্তহীন মানুষ। আরবী ভাষায় ফকীর শব্দটি ধনীর বিপরীতে বলা হয়। এ বিবেচনায় ঐসব গরীব লোক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ধনী নয়। (অর্থাৎ, যাদের কাছে এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই, যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়।) শরীঅতে ধনী হওয়ার মাপকাঠি এটাই। কিতাবুয্ যাকাতের একেবারে শুরুতে হযরত মো'আয (রাযিঃ)-এর হাদীস গিয়েছে যেখানে যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এটা ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।" (২) মিসকীন— ঐসব অভাবী মানুষ যাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছুই নেই এবং যারা একেবারে রিক্তহস্ত। (৩) যাকাত আদায়কারী— এর দ্বারা যাকাত তহ্শীলের কর্মচারী উদ্দেশ্য। এরা যদি ধনীও হয় তবুও তাদের শ্রম এবং তাদের সময়ের বিনিময়, অর্থাৎ, বেতন-ভাতা যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এ রীতিই ছিল। (৪) মুআল্লাফাতুল কুলুব— অর্থাৎ, এমন লোক, যাদের মন যোগানো দ্বীনী ও জাতীয় স্বার্থে খুবই জরুরী মনে হয়। এরা যদি সম্পদশালীও হয় তবুও এ

উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল থেকে তাদের উপর খরচ করা যায়। (৫) রিকাব— অর্থাৎ, দাস-দাসীদের মুক্তির প্রয়োজনে যাকাত থেকে অর্থ প্রদান করা যায়। (৬) ঋণগ্রস্ত— অর্থাৎ, যাদের উপর এমন কোন আর্থিক বোঝা চেপে বসেছে যে, এটা বহন করার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের নেই। যেমন, নিজের আর্থিক সঙ্গতির চেয়ে অধিক ঋণের বোঝা অথবা অন্য কোন অর্থদণ্ড তাদের উপর এসে গেল। এসব লোকের সাহায্যও যাকাত থেকে করা যায়। (৭) আল্লাহ্র পথে— অধিকাংশ আলেম ও ইমামদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনের সাহায্য ও হেফাযত এবং আল্লাহ্র দ্বীন রক্ষার কাজে নিয়োজিত মুজাহিদদের প্রয়োজন পূরণ। (৮) মুসাফির— এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব মুসাফির, সফরে বা প্রবাস জীবনে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ীর এ হাদীসে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, আমাকে যাকাত থেকে কিছু দিয়ে দিন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের এ আটটি খাত নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি যদি এ আট শ্রেণীর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমি দিতে পারি। আর যদি এমন না হয়, তাহলে আমার এ এখতিয়ার নেই যে, এ খাত থেকে আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দিব। (এখানে কেবল হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাকাত খরচ করার ক্ষেত্রসমূহের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত মাসআলা ফেকাহ্র কিতাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে অথবা বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।)

(١٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক দুই গ্রাস খাবার অথবা এক দু'টি খেজুর তাকে এখান থেকে সেখানে নিয়ে যায়; বরং আসল মিসকীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে প্রয়োজন পূরণের কোন উপকরণ পায় না এবং (নিজের অভাব গোপন রাখার কারণে) মানুষ তার অবস্থাও বুঝে না যে, তাকে দান করবে। আর সে নিজে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে সওয়ালও করে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, যে পেশাদার ভিক্ষুক মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করে, সে প্রকৃত মিসকীন ও যাকাতের হকদার নয়; বরং যাকাত-সদাকার জন্য এমন সওয়ালবিমুখ অভাবীদেরকে তালাশ করতে হবে, যারা লজ্জা ও সাধুতার কারণে নিজেদের অভাবের কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না এবং কারো কাছে সওয়াল করে না। এসব লোকই হচ্ছে প্রকৃত মিসকীন, যাদের খেদমত ও সাহায্য করা খুবই পছন্দনীয় আমল।

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ * (رواه الترمذى وابوداؤد والدارمى)

১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় ধনীর জন্য এবং সুস্থ সবল মানুষের জন্য। —তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারেমী

(١٥) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ رَجُلاَنِ اَنَّهُمَا اَتَيَا ا لنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا النَّظْرَ وَخَفَّضَهُ فَرَاٰنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ٭ (رواه ابوداؤد والنسائى)

১৫। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে দু'ব্যক্তি বলেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। আর তিনি তখন যাকাতের মাল বন্টন করছিলেন। তারা তখন এখান থেকে চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে নজর উঠিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেখলেন এবং আমাদেরকে শক্ত সবল দেখতে পেলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব। (তবে মনে রেখো যে,) এ মালে ধনী এবং সুস্থ-সবল উপার্জনক্ষম মানুষের কোন অধিকার নেই। —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এই উভয় হাদীসে ধনী দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এমন ব্যক্তি, যার কাছে নিজের খাওয়া-পরার মত প্রয়োজন কিছু উপকরণ রয়েছে এবং এ মুহূর্তে তার অর্থের প্রয়োজন নেই। এমন ব্যক্তি যদি নেসাবের মালিক না হয় আর তাকে যাকাত দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যদিও যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তার জন্য উচিত যাকাত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এমনিভাবে যে ব্যক্তি সুস্থ-সবল এবং পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম, তারও যাকাত গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা চাই। সাধারণ নিয়ম এটাই, আর এ দু'টি হাদীসে ঐ সাধারণ নীতির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এদের জন্যও যাকাত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। এ জন্যই উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী বর্ণিত হাদীসটিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দুই ব্যক্তিকে একথাও বলেছিলেন, "যদি তোমরা গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দিব।"

যাকাত-সদাকা এবং নবী পরিবার

(١٦) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ٭ (رواه مسلم)

১৬। আব্দুল মুত্তালেব ইবনে রবী'আ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এসব সদাকা-যাকাত হচ্ছে মানুষের মালের ময়লা, আর এটা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ পরিবারের জন্য হালাল নয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যাকাত-সদাকাকে এ দৃষ্টিতে মালের ময়লা বলা হয়েছে যে, যেভাবে ময়লা দূর হয়ে গেলে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনিভাবে যাকাত বের করে নিলে অবশিষ্ট মাল আল্লাহ্র নিকট পবিত্র হয়ে যায়। এতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতদূর সম্ভব যাকাতের মাল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চাই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপন বংশধর বনী হাশেমের জন্য যাকাতকে নাজায়েয সাব্যস্ত করে গিয়েছেন।

(١٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلَا اَنِّيْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَاَكَلْتُهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১৭। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় একটি খেজুর দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ আমার যদি এ আশংকা না হত যে, এটা যাকাতের কোন মাল হবে, তাহলে আমি এটা উঠিয়ে খেয়ে নিতাম। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথাটি বলা আসলে লোকদেরকে এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল যে, আল্লাহ্র কোন রিযিক ও নে'আমত— তা যত কম মূল্যেরই হোক না কেন— যদি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে এর সম্মান ও কদর করতে হবে এবং আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে এটা সৃষ্টি করেছেন, তা দিয়ে সেই কাজ নিতে হবে। এর সাথে তিনি এ কথা বলেন ঃ "আমি এটা এ জন্য খাচ্ছি না যে, হয়তো এটা যাকাতের খেজুরের মধ্য থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।" সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করার এবং সতর্কতার উপর আমল করার শিক্ষাও মুত্তাকীদেরকে দিয়েছেন।

(١٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর পুত্র হযরত হাসান (বাল্যকালে) একবার যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে নিজের মুখে দিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখে মুখে কাখ্ কাখ্ শব্দ করলেন। (অবুঝ শিশুরা মুখে কোন অখাদ্য নিলে আমরা যেমন আখ্, ওয়াক্, ছি, থু ইত্যাদি শব্দ করে থাকি) যাতে তিনি এটা ফেলে দেন। তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা (বনী হাশেম) যাকাত-সদাকা খাই না। —বুখারী, মুসলিম

(١٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَاَكَلَ مَعَهُمْ * (رواه البخارى ومسلم)

১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোন খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা কি হাদিয়া, না সদাকা ? যদি বলা হত যে, এটা সদাকা, তাহলে তিনি সাথীদেরকে (অর্থাৎ,

ঐসব সাথীদেরকে যাদের জন্য সদাকা জায়েয, যেমন, আসহাবে সুফ্ফা,) বলতেন যে ঃ তোমরা খেয়ে নাও এবং তিনি নিজে এখান থেকে খেতেন না। আর যদি বলা হত যে, এটা হাদিয়া, তাহলে তিনি নিজেও এর দিকে হাত বাড়াতেন এবং তাদের সাথে খেয়ে নিতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তিকে গরীব ও অভাবী মনে করে তার সাহায্য-সহযোগিতা হিসাবে সওয়াবের নিয়্যতে যাকিছু দান করা হয়, এটাকে শরীঅতের পরিভাষায় সদাকা বলা হয়। চাই এটা ফরয-ওয়াজিব হোক— যেমন, যাকাত অথবা ফিতরা কিংবা নফল হোক— যাকে সাধারণত আমরা সাহায্য ও খয়রাত বলে থাকি। তবে হাদিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ভক্তি ভালবাসা ও সম্পর্কের কারণে নিজের কোন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তির সামনে কোন কিছু পেশ করাকে হাদিয়া বলে।

সদাকাদাতার অবস্থান উপরে থাকে, আর গ্রহীতার নীচে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার সদাকা গ্রহণ করতেন না। আর হাদিয়াদাতা যেহেতু এর মাধ্যমে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্পর্ক ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটায় এবং এটাকে নিজের আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা খুশী মনে গ্রহণ করতেন। হাদিয়া দাতাকে দো'আ দিতেন এবং অনেক সময় নিজের পক্ষ থেকে তাকে হাদিয়া দিয়ে এর বদলা দিতেন। কিন্তু কেউ যদি সদাকা হিসাবে কিছু নিয়ে আসত, তাহলে তিনি এটা এর হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

(٢٠) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ اِصْحَبْنِىْ كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لاَ حَتّٰى اٰتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْأَلَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوَالِى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ * (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى)

২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবূ রাফে (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মাখযূমের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। ঐ মাখযূমী লোকটি আবূ রাফেকে বলল, তুমিও আমার সাথে চল, যাতে তুমিও এখান থেকে কিছু পেয়ে যাও। আর রাফে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তোমার সাথে যেতে পারব না। তারপর আবূ রাফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়, আর কোন পরিবারের গোলামও ঐ পরিবারের লোকদের মধ্যেই গণ্য। (তাই আমাদের মত তোমার জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়।) —তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে একটি কথা তো এই জানা গেল যে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খান্দানের লোকদের জন্য যাকাত বৈধ নয়,

তেমনিভাবে তাঁর এবং তাঁর খান্দানের লোকদের গোলামদের জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। এমনকি আযাদ হয়ে যাওয়ার পরও তারা যাকাতের তহবিল থেকে কিছু নিতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি এই জানা গেল যে, যাকাত তহশীলের বিনিময় ও পারিশ্রমিক হিসাবে ঐ যাকাত থেকে প্রত্যেক কর্মচারীকে (সে যদি ধনীও হয়) বেতন-ভাতা দেওয়া যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের লোক এবং তাদের গোলামদের জন্য এরও অবকাশ নেই। তৃতীয় একটি বিষয় এ হাদীস থেকে এও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামী আইন গোলামদেরকে ঐ যুগে যখন দুনিয়াতে তাদের কোন মূল্যায়নই ছিল না— কি সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছিল এবং আইনগত মালিকদের খান্দানী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পর্যন্ত তাদেরকে অংশীদার করে দিয়েছিল।

কোন্ পরিস্থিতিতে সওয়াল করা বৈধ আর কোন্ অবস্থায় নিষেধ

মুহাদ্দিসীনে কেরাম কিতাবুয্ যাকাতেই ঐসব হাদীসও লিপিবদ্ধ করে থাকেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, কোন্ অবস্থায় সওয়াল করা নিষেধ এবং কোন্ অবস্থায় এর অনুমতি রয়েছে। তাদের এ নীতির অনুসরণেই এ মা'আরিফুল হাদীসেও ঐসব হাদীস এখানে আনা হচ্ছে।

(٢١) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ اِلاَّ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَرَضْفًا يَاْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ٭ (رواه الترمذى)

২১। হুবশী ইবনে জুনাদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সওয়াল করা জায়েয নয় ধনী ব্যক্তির জন্য এবং সুস্থ-সবল মানুষের জন্য। তবে এমন ব্যক্তির জন্য জায়েয, যাকে অভাব ও দারিদ্র্য মাটিতে ফেলে দিয়েছে অথবা কোন অসহনীয় ঋণের বোঝা তার উপর চেপে গিয়েছে। আর যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়নায় নয়; বরং কেবল) সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, কেয়ামতের দিন তার এ ভিক্ষাবৃত্তি তার মুখে একটি ক্ষত হিসাবে ফুটে উঠবে এবং এ ভিক্ষালব্ধ মাল জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর হবে, যা সে ভক্ষণ করবে। এখন যার মন চায় সে সওয়াল কম করুক আর যার মন চায় সে বেশী করে সওয়াল করুক (এবং আখেরাতে এর ফল ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকুক)। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বর্ণিত (১৪ নং) হাদীসের মত ধনী দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে বর্তমানে সাহায্যের মুখাপেক্ষী ও অভাবী নয়, (যদিও সে নেসাবের মালিক ও সম্পদশালী নাও হয়।) এমন ব্যক্তির জন্য এবং ঐ সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য, যে পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে পারে, এ হাদীসে সওয়াল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাধারণ নিয়ম ও মাসআলা এটাই যে, এমন ব্যক্তির জন্য কারো সামনে হাত পাতা উচিত নয়। হ্যাঁ, অভাব ও দারিদ্র্য যদি কাউকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়ে থাকে আর সওয়াল ছাড়া তার অন্য কোন উপায় না থাকে অথবা কোন অর্থদণ্ড কিংবা কোন ভারী ঋণের বোঝা যদি তার উপর চেপে বসে থাকে এবং অন্যদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ ছাড়া এটা আদায় করতে না পারে, তাহলে এসব অবস্থায় তার জন্য সওয়াল করার ও সাহায্য প্রার্থনার অবকাশ রয়েছে।

হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে নয়; বরং নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল ও উন্নত করার জন্য অন্যের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে, তাকে কেয়ামতের দিন এ শাস্তি দেওয়া হবে যে, তার মুখমন্ডলে একটি বিশ্রী ক্ষত থাকবে। তাছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সে যা উপার্জন করেছিল সেটাকে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর বানিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে এটা ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে।

(٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ *

(رواه مسلم)

২২। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে সে আসলে নিজের জন্য জাহান্নামের অঙ্গার প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ, সে এভাবে ভিক্ষা করে যা লাভ করবে, আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নামের অঙ্গার হয়ে যাবে।) এখন সে চাইলে এটা কম করুক অথবা বেশী করে করুক। —মুসলিম

(٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَسْئَلَتُهُ فِىْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ * (رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى)

২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সওয়াল করে, অথচ তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে, যা তাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, কেয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার সওয়াল তার মুখমন্ডলে একটি ক্ষতের আকৃতি ধারণ করবে। (মুখের ক্ষত বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খুমূশ', 'খুদূশ' নাকি 'কুদূহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, এ ব্যাপারে রাবীর সন্দেহ রয়েছে। তবে সবগুলো শব্দই সমার্থবোধক।) জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি পরিমাণ মাল মানুষকে অমুখাপেক্ষী রাখে ? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা এর সমমূল্যের সোনা। —আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, যার কাছে পঞ্চাশ দেরহাম অথবা এর কাছাকাছি সম্পদ বর্তমান থাকে— যা সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে অথবা কোন ব্যবসায় লাগাতে পারে, তার জন্য সওয়াল করা গুনাহ্র কাজ। এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে এ অবৈধ সওয়ালের কারণে বিশ্রী দাগ ও ক্ষত থাকবে।

এ হাদীসে যতটুকু অর্থ-সম্পদ থাকলে সওয়াল করার বৈধতা থাকে না, এর পরিমাণ পঞ্চাশ দেরহাম বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে এক উকিয়্যা অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহামের সমমূল্যের

সম্পদের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, এ দু'টির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আবূ দাঊদ শরীফে সাহ্‌ল ইবনুল হান্‌যালিয়্যা বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ مَا الْغِنَى الَّذِيْ لَاتَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ (ধনী হওয়ার ঐ মাপকাঠিটি কি, যা বর্তমান থাকলে সওয়াল করা উচিত নয় ?) তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ (এতটুকু যে, এর দ্বারা দুপুরের খানা ও রাতের খানা চলতে পারে।) এর দ্বারা জানা গেল যে, যদি কারো কাছে এক দিনের খাবারের ব্যবস্থাও থাকে, তাহলে তার জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়।

ঐ অর্থ-বিত্ত যার ফলে যাকাত ফরয হয়, এর মাপকাঠি তো নির্ধারিত রয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও আগেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পরিমাণ বিত্ত, যা বর্তমান থাকলে সওয়াল করা উচিত নয়, এর মাপকাঠি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এ ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠির কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি অভাজনের নিকট এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে, এটা বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কোন কোন অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তি এমন হতে পারে যে, অল্প বিস্তর সম্পদ থাকলেও তাদের জন্য সওয়াল করার অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু এ সম্পদ যদি ৪০/৫০ দেরহামের কাছাকাছি হয়, তাহলে একেবারেই এর কোন অবকাশ নেই। আর কোন কোন অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তি এমনও হতে পারে যে, তাদের কাছে যদি একদিনের খোরাকীও থাকে, তবুও তাদের জন্য সওয়াল করার কোন অবকাশ নেই। এর আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও দেওয়া যায় যে, যেসব হাদীসে ৪০ অথবা ৫০ দেরহামকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে অবকাশ ও ফত্‌ওয়া হিসাবে তা বলা হয়েছে। আর যেখানে একদিনের খোরাকী থাকলেও সওয়াল করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেটা উঁচুস্তরের তাকওয়া ও কঠোর অনুশাসনের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

সওয়ালে সর্বাবস্থায়ই অপমান রয়েছে

(٢٤) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِىَ السَّائِلَةُ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দান খয়রাত এবং সওয়াল থেকে বিরত থাকার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর উপরের হাত হচ্ছে দানের হাত এবং নীচের হাত হচ্ছে ভিক্ষার হাত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, দাতার অবস্থান উপরে এবং সম্মানের, আর গ্রহীতার অবস্থান নীচে এবং অপমানের। তাই মু'মিন ব্যক্তিকে দাতা হতে হবে এবং যতদূর সম্ভব নিজেকে সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার অপমান থেকে বাঁচাতে হবে।

সওয়াল করতে বাধ্য হলে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে

(٢٥) عَنْ اِبْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ * (رواه ابوداؤد والنسائى)

২৫। তাবেয়ী ইবনুল ফারাসী থেকে বর্ণিত, ফারাসী (রাযিঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার প্রয়োজনে মানুষের কাছে সওয়াল করব ? তিনি বললেন ঃ (যতদূর সম্ভব) সওয়াল করতে যেয়ো না। আর যদি কোন উপায়ান্তর না থাকে, তাহলে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কাছে সওয়াল করবে। —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

নিজের প্রয়োজন মানুষের কাছে নয় আল্লাহ্র কাছে পেশ করবে

(٢٦) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَا اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى اٰجِلٍ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন অভাব অনটন দেখা দিল আর সে এটা মানুষের সামনে পেশ করল (এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইল,) তার এ অভাব দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি এটা আল্লাহ্র সামনে পেশ করল, খুবই আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এ অভাব দূর করে দিবেন— হয়তো দ্রুত মৃত্যু দিয়ে (যদি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গিয়ে থাকে) অথবা কিছু বিলম্বে স্বচ্ছলতা দান করে। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী

মানুষের কাছে সওয়াল না করার উপর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

(٢٧) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ اَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا * (رواه ابوداؤد والنسائى)

২৭। হযরত সাওবান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে মানুষের কাছে কোন কিছু সওয়াল করবে না, আমি তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব। সাওবান বললেন, আমি এ প্রতিজ্ঞা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কারণে হযরত সাওবান কারো কাছে কোন কিছু সওয়াল করতেন না। —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

**যদি সওয়াল ও মনের লোভ ছাড়া কোন কিছু পাওয়া যায়,
তাহলে এটা গ্রহণ করে নেওয়া চাই**

(٢٨) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهٖ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ * (رواه البخارى ومسلم)

২৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে কিছু মাল দিতে চাইতেন। আমি তখন বলতাম, আমার চেয়ে বেশী অভাবী কাউকে এটা দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ এটা গ্রহণ করে নাও এবং নিজের মালিকানায় নিয়ে নাও। (তারপর ইচ্ছা করলে) তুমি এটা দান করে দাও। বস্তুতঃ যে মাল-সম্পদ তোমার কাছে এভাবে আসে যে, তুমি তা পাওয়ার জন্য লালায়িতও নও এবং সওয়ালকারীও নও, তা (আল্লাহ্‌র দান মনে করে) গ্রহণ করে নাও। আর যা এভাবে তোমার কাছে আসে না, তার পেছনে তোমার মনকে ধাবিত করো না। —বুখারী, মুসলিম

**যে পর্যন্ত পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করা যায়
সে পর্যন্ত সওয়াল করতে নেই।**

(٢٩) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَّسْئَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ * (رواه البخارى)

২৯। হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন (অভাবী) মানুষের এ কাজটি যে, সে রশি নিয়ে জঙ্গলে যাবে এবং পিঠে লাকড়ীর বোঝা বহন করে এনে বিক্রি করবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা সওয়ালের লাঞ্ছনা থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এটা তার জন্য ঐ কাজ অপেক্ষা অনেক ভাল যে, সে মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে। তারপর তারা তাকে কিছু দিবে অথবা না করে দিবে। —বুখারী

(٣٠) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُهٗ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَيْئٌ فَقَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ وَنَبْسُطُ بَعْضَهٗ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَيْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ فَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِيَّ وَقَالَ لِشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَأْتِنِىْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ

فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اُرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَ يَبِيْعُ فَجَاءَهُ وَقَدْ اَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيْئَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لاَتَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلٰثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ * (رواه ابوداؤد)

৩০। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী (দরিদ্র) লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু সাহায্য চাওয়ার জন্য আসল। তিনি বললেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছুই নেই! সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা গায়ে দেই, আর কিছু অংশ বিছিয়ে নেই। আর আছে একটি পেয়ালা, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন ঃ এ দু'টি জিনিসই আমার কাছে নিয়ে আস। কথামত সে এ দু'টি জিনিস এনে তাঁকে দিল। তিনি এ কম্বল ও পেয়ালাটি হাতে নিলেন এবং (নিলামের নিয়মে) উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ কে এ জিনিস দু'টি কিনতে প্রস্তুত আছ ? এক ব্যক্তি বলল, আমি এগুলো এক দেরহামে খরিদ করতে রাজী আছি। তিনি বললেন ঃ এক দেরহামের চেয়ে বেশী দিয়ে কে কিনবে ? (কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন।) তখন অন্য এক ব্যক্তি বলল, আমি দুই দেরহাম দিয়ে নিতে রাজী আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট থেকে দুই দেরহাম নিয়ে ঐ আনসারীকে দিয়ে দিলেন, এবং তাকে বললেন ঃ এখান থেকে এক দেরহাম দিয়ে কিছু খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও এবং অপর দেরহামটি দিয়ে একটি কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে আস। কথামত সে তাই করল এবং কুড়াল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হল। তিনি নিজ হাতে এতে কাঠের একটি বাট লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ যাও এবং জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি কর। আর আমি যেন ১৫ দিন পর্যন্ত তোমাকে না দেখি। (অর্থাৎ, দু'সপ্তাহ পর্যন্ত এ কাজই করে যাও, এর মধ্যে আমার কাছে আসার চেষ্টাও করো না।) তারপর লোকটি চলে গেল এবং নির্দেশ অনুযায়ী জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে লাগল। তারপর একদিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। আর এর মধ্যে সে লাকড়ী বিক্রি করে ১০ দেরহাম উপার্জন করে নিয়েছিল এবং এখান থেকে কিছু দেরহাম দিয়ে সে কাপড় কিনে নিয়েছিল আর কিছু দেরহাম দিয়ে খাবার সামগ্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার পরিশ্রমের এ উপার্জন তোমার জন্য এর চেয়ে অনেক ভাল যে, কেয়ামতের দিন মানুষের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনার একটি দাগ তোমার কপালে থাকবে। তারপর তিনি বললেন ঃ সওয়াল করা কেবল তিন প্রকার মানুষের জন্যই বৈধ। (১) অভাব ও দারিদ্র্য যাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। (২) চরম লাঞ্ছিত দেনাদার, (যা আদায়ে সে অপারগ।) (৩) যার উপর কোন রক্তপণ এসে গিয়েছে। (আর সে এটা আদায় করতে অক্ষম।) —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন রাখে না। আফসোস! যে নবীর এ শিক্ষা ও এ কর্মপদ্ধতি ছিল, আজ সেই নবীর উম্মতের মধ্যে পেশাদার ভিক্ষুক ও সাহায্য প্রার্থনাকারীদের

একটি শ্রেণী বিদ্যমান। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আলেম ও পীর সেজে সম্মানজনক পদ্ধতিতে ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। এরা ভিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি প্রতারণা ও ধর্মব্যবসায়ের দরুনও অপরাধী।

যাকাত ছাড়া অন্যান্য আর্থিক দান-খয়রাত

(٣١) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الاية * (رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى)

৩১। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মালের মধ্যে যাকাত ছাড়াও আরো হক রয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج الخ

অর্থাৎ, প্রকৃত পুণ্য (এর মাপকাঠি) এটা নয় যে, তোমরা (এবাদতে) পশ্চিম দিকে মুখ করবে, না পূর্ব দিকে; বরং প্রকৃত পুণ্যের পথ কেবল তাদের পথ, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ও তাঁর নবী রাসূলদের প্রতি। আর তারা সম্পদের ভালবাসা সত্ত্বেও তা খরচ করে আত্মীয়দের উপর, ইয়াতীমদের উপর, মিসকীনদের উপর, পথিক মুসাফিরদের উপর সওয়ালকারীদের উপর এবং দাসমুক্তির কাজে। আর তারা ঠিকমত নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, কেউ যেন এ ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, নির্ধারিত যাকাত (অর্থাৎ, বর্ধিষ্ণু সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করে দেওয়ার পর মানুষের উপর আল্লাহ্‌র আর কোন হক ও দাবী অবশিষ্ট থাকে না এবং সে এ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ব্যাপারটি আসলে এমন নয়; বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যাকাত আদায় করে দেওয়ার পরও আল্লাহ্‌র অভাবী বান্দাদের সাহায্যের দায়িত্ব বিত্তবানদের উপর থেকে যায়। যেমন, একজন ধনী মানুষ হিসাব করে সম্পূর্ণ যাকাত আদায় করে দিয়ে দিল, তারপর সে জানতে পারল যে, তার কোন প্রতিবেশী উপোস করছে অথবা অমুক আত্মীয় চরম অভাবে রয়েছে কিংবা কোন অভিজাত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা কোন মুসাফির এমন অবস্থায় তার কাছে এসে পৌঁছল যে, এ মুহূর্তে তার সাহায্যের প্রয়োজন। এসব অবস্থায় এ অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এ বিষয়টি বর্ণনা করলেন এবং প্রমাণ হিসাবে সূরা বাকারার উপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। এ আয়াতে পুণ্য কর্মসমূহের

তালিকায় ঈমানের পর ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ইত্যাদি শ্রেণীসমূহের আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। এরপর নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এখানে ঐসব দুর্বল ও অভাবী শ্রেণীর মানুষদের আর্থিক সাহায্যের যে কথা বলা হয়েছে, এটা যাকাতের বাইরে অন্যান্য দান-খয়রাত। কেননা, যাকাতের আলোচনা এ আয়াতেই স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান রয়েছে।

আমীর-গরীব প্রতিটি মুসলমানের জন্য সদাকা অপরিহার্য

(٣٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَ يَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهٗ لَهٗ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৩২। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি মুসলমানের উপর সদাকা জরুরী। লোকেরা বলল, কারো কাছে যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে, তাহলে সে কি করবে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ পরিশ্রম করে নিজের হাতে উপার্জন করবে এবং তা দিয়ে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদাকাও করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, এটাও যদি করতে না পারে, তাহলে কি করবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কোন বিপদগ্রস্ত ও অভাবী মানুষের কোন কাজ করে দিয়ে তার সাহায্য করবে। (এটাও এক ধরনের সদাকা।) তারা আবার প্রশ্ন করল, সে যদি এটাও করতে না পারে, তাহলে কি করবে ? তিনি বললেন ঃ তাহলে নিজের মুখ দিয়েই মানুষকে ভাল কাজের কথা বলবে। তারা আবার জিজ্ঞাসা করল, সে যদি এটাও করতে না পারে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ (কমপক্ষে) নিজেকে মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। (অর্থাৎ, সে এ ব্যাপারে চেষ্টা করবে যে, তার দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয়।) কেননা, তার জন্য এটাও এক ধরনের সদাকা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, অর্থবিত্ত না থাকার কারণে যাদের উপর যাকাত ফরয হয় না, তাদেরকেও সদাকা করতে হবে। যদি টাকা-পয়সা থেকে হাত একেবারে শূন্য থাকে, তাহলে কষ্ট ও পরিশ্রম করে এবং নিজের পেট কেটে হলেও সদাকার সৌভাগ্য অর্জন করা চাই। যদি নিজের বিশেষ অবস্থার কারণে কেউ এরূপ করতেও অক্ষম হয়, তাহলে কোন দুস্থ মানুষের সেবাই করে দিবে। আর যদি হাত-পা দিয়ে কোন কাজ করতে না পারে, তাহলে মুখ দিয়েই তার উপকার ও খেদমত করবে।

হাদীসটির প্রাণবস্তু ও এর মর্মবাণী এটাই যে, প্রতিটি মুসলমান— চাই সে বিত্তবান হোক অথবা গরীব, শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হোক অথবা দুর্বল— তার জন্য উচিত, সে যেন অর্থ দিয়ে, নৈতিক সাহায্য সমর্থন দিয়ে, মুখের কথা দিয়ে— এক কথায় যেভাবে সম্ভব এবং যতদূর সম্ভব— আল্লাহ্‌র অভাবী ও বিপদগ্রস্ত বান্দাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এতে পিছপা না হয়।

দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহদান ও এর বরকত

(٣٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ * (رواه البخارى ومسلم)

৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি (আমার অভাবী বান্দাদের উপর) নিজের উপার্জন থেকে খরচ কর, আমি আপন ভান্ডার থেকে তোমাকে দিতে থাকব। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এটা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি ও জিম্মাদারী যে, কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র অভাবী বান্দাদের প্রয়োজন পূরণে অর্থ ব্যয় করে যায়, তাহলে সে আল্লাহ্র গায়েবী ভান্ডার থেকে পেতেই থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যেসব বান্দাকে ইয়াকীনের সম্পদ দান করেছেন, আমরা দেখেছি যে, তাদের রীতি এটাই। আর তাদের সাথে তাদের মহান পরওয়ারদিগারের আচরণও এটাই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকেও এ ইয়াকীন ও বিশ্বাসের কিছু অংশ দান করুন।

জ্ঞাতব্য ঃ যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বরাত দিয়ে কোন কথা বলেন এবং এটা কুরআনের আয়াত না হয়, সেই হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বলা হয়। সদ্য উল্লেখিত হাদীসটিও এই প্রকারের।

(٣٤) عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ * (رواه البخارى ومسلم)

৩৪। হযরত আসমা বিন্তে আবূ বকর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাঁর পথে মুক্তহস্তে খরচ করে যাও, হিসাব করতে যেয়ো না। (অর্থাৎ, এ চিন্তায় পড়ো না যে, আমার কাছে কত আছে, আর এখান থেকে আল্লাহ্র পথে কতটুকু খরচ করব।) তুমি যদি এভাবে হিসাব করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে হিসাব করেই দেবেন। সম্পদ আঁকড়ে ধরে ও আবদ্ধ করে রাখবে না। এমন করলে আল্লাহ্ও তোমার সাথে এমন আচরণই করবেন। (অর্থাৎ, রহমত ও বরকতের দরজা তোমার উপর বন্ধ করে দেবেন।) যতদূর সম্ভব, মুক্তহস্ত হওয়ার চেষ্টা কর। —বুখারী, মুসলিম

(٣٥) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَءْ بِمَنْ تَعُوْلُ * (رواه مسلم)

৩৫। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম-সন্তান! আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এটা আল্লাহ্র পথে খরচ করে ফেলা তোমার জন্য উত্তম, আর এটা ধরে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গলকর।

হ্যাঁ, জীবন ধারণের প্রয়োজন পরিমাণ রেখে দেওয়াতে কোন নিন্দা নেই। আর খরচের বেলায় নিজের পোষ্যদের থেকে শুরু কর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্মবাণী এই যে, মানুষের জন্য উত্তম এটাই যে, যে সম্পদ সে উপার্জন করবে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে তার কাছে আসবে, সেখান থেকে সে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ তো নিজের কাছে রেখে দিবে, বাকী সম্পদ আল্লাহ্র পথে তাঁর বান্দাদের সাহায্যার্থে খরচ করে দেবে। আর এক্ষেত্রে নিজের পোষ্য ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আল্লাহ্র পথে যা খরচ করে দেওয়া হয়, সেটাই কাজে আসবে

(٣٦) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ مَابَقِىَ مِنْهَا اِلاَّ كَتْفُهَا قَالَ بَقِىَ مِنْهَا غَيْرُ كَتْفِهَا * (رواه الترمذى)

৩৬। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, লোকেরা একটি ছাগল যবেহ করল (এবং এর গোশ্ত আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্টন করে দেওয়া হল।) এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছাগলের কি অবশিষ্ট রয়েছে ? আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, কেবল একটি রান রয়েছে, (বাকী সব শেষ।) তিনি বললেন ঃ এ রানটি ছাড়া যা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে, সেটাই আসলে অবশিষ্ট রয়েছে। (অর্থাৎ, আখেরাতে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।) —তিরমিযী

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ব্যাপারে তাওয়াক্কুলধারীদের রীতি

(٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَيْئٌ اِلاَّ شَيْئٌ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ * (رواه البخارى)

৩৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা হয়ে যায়, তাহলে আমার জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় হবে যে, তিন রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আমি এটা আল্লাহ্র রাহে খরচ করে ফেলব, আর এর কিছুই আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে না। হ্যাঁ, এ পরিমাণ রেখে দিতে পারি, যার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়। —বুখারী

(٣٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى بِلاَلٍ وَعِنْدَهٗ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَا بِلاَلُ ؟ قَالَ شَيْئٌ اِدَّخَرْتُهٗ لِغَدٍ فَقَالَ اَمَا تَخْشٰى اَنْ تَرٰى لَهٗ بُخَارًا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنْفِقْ يَابِلاَلُ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلاَلاً * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন হযরত বিলালের কাছে এসে দেখলেন যে, তার কাছে খেজুরের একটি স্তূপ রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে বিলাল! এটা কি ? বিলাল উত্তর দিলেন, আমি ভবিষ্যতের জন্য এগুলো সঞ্চয় করে রেখেছি। (যাতে সামনে জীবিকার ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।)

তিনি বললেন ঃ তুমি কি ভয় কর না যে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তুমি এর উত্তাপ ও ধোঁয়া দেখবে। হে বিলাল! যা হাতে আসে সেটা নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য খরচ করতে থাক আর আরশের মালিকের পক্ষ থেকে দারিদ্র্যের ভয় করো না। (অর্থাৎ, এ বিশ্বাস রাখ যে, যেভাবে তিনি বর্তমানে এটা দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এভাবেই দিয়ে যাবেন। তাঁর ভান্ডারে কিসের কমতি আছে ? তাই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তা করো না।) —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত বিলাল (রাযিঃ) সুফ্ফাবাসীদের একজন ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত তাওয়াক্কুলের যিন্দেগীর পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাদের জন্য আগামী দিনের খাবার সঞ্চয় করাও শোভনীয় ছিল না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন– যদিও সাধারণ মানুষের জন্য এ বিষয়টি সম্পূর্ণ জায়েয; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোন কোন সাহাবীকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, নিজের পরিবার বর্গের জন্য কোন কিছু না রেখে সম্পূর্ণ মাল দান করে দেওয়া যাবে না। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আসহাবে সুফ্ফার মত খাঁটি তাওয়াক্কুলের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাদের জন্য এ কর্মপদ্ধতির অবকাশ ছিল না। কেননা, যার মর্তবা যত উঁচু তার কর্মপদ্ধতিও তত ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

হাদীসটির শেষ বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র যে বান্দা কল্যাণের পথে সাহস নিয়ে নিজের অর্থ ব্যয় করবে, সে আল্লাহর দানে কখনো ঘাটতি দেখবে না।

যে বিত্তশালী ব্যক্তি মুক্তহস্তে আল্লাহর পথে ব্যয়
করে না, সে খুবই ক্ষতির মুখে রয়েছে

(٣٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ * (رواه البخارى ومسلم)

৩৯। হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল্যামের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন কা'বা ঘরের ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে যখন দেখলেন, তখন বলে উঠলেন ঃ কা'বার মালিকের শপথ! ওরা খুবই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আমি আরয করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান! তারা কারা, যারা খুবই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ যারা বিরাট সম্পদের অধিকারী। তবে, তাদের মধ্য থেকে ঐসব লোক এর বাইরে, যারা সামনে, পেছনে, ডানে, বায়ে (অর্থাৎ, চতুর্দিকে কল্যাণ খাতে) নিজেদের অর্থ-সম্পদ মুক্তহস্তে খরচ করে যায়। কিন্তু সম্পদশালী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে এমন লোক কমই রয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতার জীবন অবলম্বন করে রেখেছিলেন, আর তাঁর মেযাজ ও স্বভাবের দিক থেকে এটাই তাঁর জন্য উত্তম ছিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তার মনস্তুষ্টির জন্য বললেন যে, সম্পদশালী হওয়া– যা বাহ্যতঃ বিরাট নেয়ামত– প্রকৃত পক্ষে এক বিরাট পরীক্ষাও বটে। আর এ পরীক্ষায় ঐসব বান্দারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা এতে মন লাগায় না এবং সম্পূর্ণ মুক্তহস্তে সম্পদকে কল্যাণ খাতে খরচ করে দেয়। যারা এমন করবে না, পরিণামে তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সদাকা ও দান-খয়রাতের বৈশিষ্ট্য ও বরকত

(٤٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ * (رواه الترمذى)

৪০। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সদাকা আল্লাহ্র ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং মন্দ-মৃত্যু রোধ করে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যে– এমনকি গাছের শিকড় ও পাতার মধ্যে বিশেষ প্রভাব ও ক্রিয়া থাকে, তেমনিভাবে মানুষের ভাল-মন্দ কর্মসমূহেরও বিশেষ ক্রিয়া ও শক্তি থাকে– যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই জানা যায়। এ হাদীসে সদাকা ও দান-খয়রাতের দু'টি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) যদি বান্দার কোন পদস্খলন ও পাপের কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ তার প্রতি ছুটে আসতে চায়, তাহলে সদাকা এ ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং বান্দা এ কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির স্থলে তাঁর সন্তুষ্টি ও দয়ার অধিকারী হয়ে যায়। (২) সদাকা মন্দ-মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। (অর্থাৎ, সদাকার কারণে তার জীবনের সমাপ্তি ভাল অবস্থায়– ঈমানের সাথে হয়।) দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, এটা ঐ ধরনের মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখে– যাকে দুনিয়ায় অপমৃত্যু মনে করা হয়।

(٤١) عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَدَقَتُهُ * (رواه احمد)

৪১। মারছাদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক সাহাবী বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মু'মিনের উপর ছায়া হবে তার সদাকা। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন হাদীসে অনেক পুণ্যকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এ আমলসমূহ ছায়া লাভের ওসীলা হবে। এ হাদীসে সদাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর একটি বরকত এ প্রকাশিত হবে যে, দানকারীর জন্য তার এ দান ছায়ানীড় হয়ে যাবে– যা ঐ দিনের উত্তাপ ও প্রচণ্ড গরম থেকে তাকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বাস্তব বিষয়ের বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য আমাদেরকে নসীব করুন।

দানে ধন-সম্পদ কমে না; বরং এতে বরকত আসে

(٤٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَازَادَ اللّٰهُ بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ * (رواه مسلم)

৪২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সদাকায় মাল কমে যায় না; (বরং বৃদ্ধি পায়,) ক্ষমা দ্বারা মানুষ ছোট হয় না; বরং আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। —মুসলিম

(٤٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاهِىَ قَالَ اَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَزِيْدُ * (رواه احمد)

৪৩। আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ যর আরয করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি বলুন, সদাকা কি ? (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর কি বিনিময় পাওয়া যাবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ দ্বিগুণ-বহুগণ। (অর্থাৎ, কেউ আল্লাহ্র পথে যা দান করবে, বিনিময়ে এর কয়েক গুণ পাবে।) আর আল্লাহ্র কাছে আরো অতিরিক্ত রয়েছে। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, যে যতটুকু আল্লাহ্র পথে দান করবে, আল্লাহ্ এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী তাকে দেবেন। অন্য কোন কোন হাদীসে দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্তের উল্লেখ রয়েছে। আর এটাও শেষ সীমা নয়, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এর চেয়েও বেশী দিবেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ তিনি যাকে ইচ্ছা আরো বেশী দেবেন। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত।

কোন কোন মনীষী এ হাদীসের এ অর্থ বুঝেছেন যে, সদাকা ও দান–খয়রাতের বিনিময়ে কয়েক গুণ তো আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আর আখেরাতে এর যে প্রতিদান দেওয়া হবে, সেটা এর চেয়ে অনেক বেশী হবে।

আল্লাহ্র বান্দাদের এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস ও ভরসা করে তারা এখলাছের সাথে তাঁর পথে তাঁর বান্দাদের উপর যতটুকু খরচ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা এর কয়েক গুণ তাদেরকে এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এর জন্য এখলাছ ও পূর্ণ বিশ্বাস শর্ত।

অভাবীদেরকে পানাহার ও বস্ত্র দানের প্রতিদান ও সওয়াব

(٤٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرًى كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

৪৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান অপর কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশতের সবুজ পোশাক পরাবেন। যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্তের ফল খাওয়াবেন। আর যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে পিপাসার সময় পানি পান করাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশতের মোহরযুক্ত পানীয় পান করাবেন। —আবূ দাউদ, তিরমিযী

(٤٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلاَّ كَانَ فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ * (رواه احمد والترمذى)

৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কোন কাপড় দান করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হেফাযতে থাকবে, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির গায়ে এর একটি টুকরাও অবশিষ্ট থাকবে। —আহমাদ, তিরমিযী

(٤٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ مَا قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ * (رواه الترمذى وابن ماجة)

৪৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, আমি তখন তাঁকে দেখতে আসলাম। আমি যখন গভীরভাবে তাঁর চেহারার দিকে দেখলাম, তখন বুঝে নিলাম যে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তারপর তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন, সেটা ছিল এই ঃ লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, (আল্লাহ্র অভাবী বান্দাদেরকে) খাবার দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর আর রাতে মানুষ যখন ঘুমে নিমগ্ন থাকে, তখন নামায পড়। এমন করলে শান্তিতে জান্নাতে যেতে পারবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

অভুক্ত-পিপাসিত পশুদেরকে খাবার-পানি দেওয়াও সদাকা বিশেষ

(٤٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَالِكَ قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক দুশ্চরিত্রা নারীকে এ আমলের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে যে, সে একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখল যে, একটি কুকুর জিহ্বা বের করে আছে এবং (তার অবস্থা এই যে,) সে যেন পিপাসায় মরে যাবে। সে তখন তার পায়ের চামড়ার মোজা খুলল এবং নিজের ওড়নার সাথে বেঁধে নিল। তারপর এর দ্বারা কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। এ আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের সেবায়ও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ অনুভূতিশীল প্রত্যেক প্রাণীর (যার ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব হয়) সেবাতেই প্রতিদান রয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

(٤٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৪৮। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করে অথবা শষ্য বপন করে, তারপর এখান থেকে যে ফল ও শষ্যদানা কোন মানুষ, পাখী অথবা কোন পশু খায়, এটা তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হবে। —বুখারী, মুসলিম

আল্লাহ্র বান্দাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর বিনিময় জান্নাত

(٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ * (رواه البخارى ومسلم)

৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, যার উপর একটি গাছের ডাল ছিল। (যার দরুন চলাচলকারীদের কষ্ট হত।) লোকটি তখন মনে মনে বলল, আমি অবশ্যই এটা মুসলমানদের চলাচলের পথ থেকে সরিয়ে দেব, যাতে তাদের কষ্ট না হয়। (তারপর সে তাই করল।) ফলে তাকে জান্নাত দেওয়া হল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন আমল বাহ্যতঃ খুব ছোট ও মামুলী ধরনের হয়; কিন্তু কখনো কখনো এগুলো অন্তরের এমন অবস্থা ও এমন আবেগ-অনুভূতি নিয়ে করা হয়, যা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান ও প্রিয় হয়ে থাকে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় ঢেউ জাগে। ফলে ঐ বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেওয়া হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত উপরের হাদীসে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর উপর এক ভ্রষ্টা নারীর গুনাহমাফীর যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং এ হাদীসে মানুষের চলাচলের পথ থেকে কেবল একটি গাছের ডাল সরিয়ে দেওয়ার উপর এক ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর রহস্য এটাই। والله اعلم

কোন্ সময়ের দান-সদাকার সওয়াব বেশী

(٥٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ * (رواه البخارى ومسلم)

৫০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ দানের সওয়াব বেশী ? তিনি বললেন ঃ সুস্থ এবং সম্পদের চাহিদা থাকা অবস্থায় যখন তুমি দান কর, যখন তোমার দারিদ্র্যের ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ার লোভও

থাকে। তুমি এমন করো না যে, যখন রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যায়, তখন বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু। কেননা, এখন তো এ মাল অমুকের (ওয়ারিসদের) হয়েই গিয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের এটা সাধারণ দুর্বলতা যে, যে পর্যন্ত সে সুস্থ-সবল থাকে এবং মৃত্যু তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে না যায়, সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করে। শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ করে ফেল, তাহলে তোমার সম্পদ কমে যাবে, নিজেই গরীব ও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। এ জন্য দানের দিকে তাদের হাত অগ্রসর হয় না। কিন্তু যখন মৃত্যু সামনে এসে যায় এবং জীবনের আশা আর বাকী না থাকে, তখন তাদের দান-খয়রাতের কথা স্মরণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ কর্মপদ্ধতি ঠিক নয়; বরং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও পছন্দনীয় দান হচ্ছে সেটা, যা বান্দা সুস্থ-সবল অবস্থায় করে এবং তার সামনে নিজের সমস্যা ও নিজের ভবিষ্যতচিন্তাও থাকে। নিজের ভবিষ্যত চিন্তা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের সওয়াব লাভের আশায় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এ অবস্থায়ই আল্লাহ্র বান্দাদের উপর খরচ করে যায়। এমন বান্দাদের জন্য কুরআন মজীদে সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করাও দান বিশেষ

নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অল্পবিস্তর অর্থ ব্যয় তো সবাই করে থাকে। কিন্তু এ অর্থ ব্যয়ে মানুষের ঐ আত্মিক আনন্দ লাভ হয় না, যা অন্যান্য অভাবী ও গরীব মিসকীনকে দান করলে হয়ে থাকে। কেননা, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করাকে মানুষ সওয়াবের কাজ মনে করে না; বরং এটাকে বাধ্যতামূলক অথবা মনের চাহিদা মনে করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং সওয়াবের নিয়্যতে খরচ করা চাই। এ অবস্থায় এ খাতে যা ব্যয় করা হবে, সেটা দানের মতই আখেরাতের ব্যাংকে জমা হবে; বরং অন্যদের উপর খরচ করার চাইতে এতে সওয়াব বেশী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ শিক্ষা দ্বারা আমাদের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের একটি বিরাট দরজা খুলে যায়। এখন আমরা যাকিছু আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়া পরার জন্য বৈধ সীমার মধ্যে খরচ করব, সেটা এক ধরনের দান ও সওয়াবের কাজ হবে। শর্ত কেবল একটাই যে, আমরা সওয়াব লাভের মানসিকতা ও নিয়্যত নিয়ে খরচ করব।

(٥١) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৫১। হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বান্দা নিজের পরিবার-পরিজনের উপর সওয়াবের নিয়্যতে কিছু খরচ করবে, এটা তার জন্য সদাকা ও দান হিসাবে গণ্য হবে। —বুখারী, মুসলিম

(٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ *

(رواه ابوداؤد)

৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ দানটি উত্তম ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ঐ দান, যা কোন গরীব মানুষ নিজের শ্রমের উপার্জন থেকে করে। আর তোমরা সর্বাগ্রে তাদের উপর খরচ কর, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর। (অর্থাৎ, নিজের স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর।) —আবূ দাঊদ

(٥٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِىْ دِيْنَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى اَهْلِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَعْلَمُ * (رواه ابوداؤد والنسائى)

৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। (তাই আপনি বলুন যে, আমি এটা কোথায় খরচ করব এবং কাকে দেব ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি এটা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেল। সে বলল, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার সন্তানদের উপর খরচ কর। সে বলল, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার স্ত্রীর প্রয়োজনে খরচ করে ফেল। সে বলল, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার খাদেমের উপর খরচ করে ফেল। সে বলল, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমিই ভাল জান (যে, তোমার আত্মীয়দের মধ্যে কে এর বেশী হকদার।) —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবতঃ এ ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, লোকটি নিজেই অভাবী ও গরীব। আর তার কাছে কেবল একটি দীনারই রয়েছে এবং সে এটা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও আখেরাতের সওয়াবের জন্য কোথাও খরচ করতে চায়। তার এ কথা জানা নেই যে, মু'মিন বান্দা যা কিছু নিজের প্রয়োজনে খরচ করে অথবা আপন স্ত্রী-সন্তান ও গোলামদের পেছনে ব্যয় করে, এর সবকিছুই সদাকা হিসাবে গণ্য হয় এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের ওসীলা হয়। এ জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ক্রমানুসারে এ পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশ এটাই যে, মানুষ প্রথমে ঐসব হক ও দায়িত্ব পালন করবে, যেগুলো ব্যক্তিগতভাবেই তার উপর বর্তায় এবং নিজস্ব দায়িত্ব হিসাবেই বিবেচিত হয়। তারপর সে সামনে অগ্রসর হবে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্র ঐসব বিশেষ বান্দা– যারা তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতার উঁচু স্তর অর্জন করে নিয়েছে এবং তাদের পরিবার-পরিজনও এ মহাসম্পদ থেকে অংশ লাভ করে নিয়েছে, তাদের জন্য এটা ঠিক যে, নিজেরা উপোস করবে, পেটে পাথর বাঁধবে আর ঘরে যে খাবার রয়েছে সেটা গরীব-দুস্থদেরকে বিলিয়ে দেবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের অবস্থা ও রীতি এটাই ছিল। আল্লাহ্

তা'আলা বলেন ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ, তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা হাশর)

আত্মীয়দেরকে দান করার বিশেষ ফযীলত

(٥٤) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلٰى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ * (رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى)

৫৪। হযরত সুলায়মান ইবনে আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন অপরিচিত মিসকীনকে কিছু দান করা কেবল সদাকাই। আর কোন আত্মীয়কে দান করার মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক দিকে এটা সদাকা, অপর দিকে আত্মীয়তার হক আদায়। —আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

(٥٥) عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْئَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذَالِكَ يُجْزِئُ عَنِّىْ وَاِلاَّ صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ ائْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِىْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حُجُوْرِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَئَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

৫৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যয়নব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর এক ভাষণে মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ) হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র পথে দান কর– যদি তোমাদের অলংকার থেকেও দিতে হয়। যয়নব বলেন, আমি একথা শুনে আমার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে আসলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিশেষভাবে দান-সদাকার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তুমিও গরীব মানুষ। তাই তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা কর (যে, আমি যদি তোমাকে

দান করে দেই, তাহলে আমার সদাকা আদায় হবে কি না ?) যদি তোমাকে আমার দান করা ঠিক হয়, তাহলে আমি তোমাকেই দিয়ে দেব। অন্যথায় অন্যদের পেছনে খরচ করে ফেলব। যয়নব বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বললেন; বরং তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তারপর আমি গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, আনসারী এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারও উদ্দেশ্য সেটাই, যা আমার উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ, সেও এ মাসআলা জানার উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছে।) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দান করেছিলেন। (যে কারণে যে কেউ তাঁর সামনে গিয়ে কথা বলার সাহস পেত না। এ জন্য আমাদেরও তাঁর সামনে গিয়ে সরাসরি কথা বলার সাহস হয়নি।) এর মধ্যে হযরত বিলাল বাইরে আসলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে বলুন যে, দু'জন মহিলা আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা আপনার কাছে জানতে চায় যে, তারা যদি তাদের স্বামীকে এবং তাদের কোলের সন্তানদেরকে কিছু দান করতে চায়, তাহলে এটা আদায় হবে কি না (এবং তারা এর সওয়াব পাবে কি না ?) তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা বলবেন না যে, আমরা কারা। বিলাল ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন এবং এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এ দুই মহিলা কে ? বিলাল বললেন, একজন এক আনসারী মহিলা, আর অপরজন যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ যয়নব ? বিলাল উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের স্ত্রী। তিনি তখন বললেন ঃ হ্যাঁ, (তাদের সদাকা আদায় হয়ে যাবে; বরং এমন করলে) তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। একটি দানের সওয়াব আর অপরটি আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব। —বুখারী, মুসলিম

(٥٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَ اِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْ بِرَّهَا وَ ذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ بَخٍ ذَالِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ * (رواه البخارى ومسلم)

৫৬। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর বাগানের মালিক হিসাবে মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ)। আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল 'বায়রুহা' নামক বাগানটি। এটা মসজিদে নববীর সামনেই

ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং এর সুমিষ্ট পানি পান করতেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর, তখন আবূ তালহা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তো বলছেন, তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে খরচ কর। আর আমার সকল সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে বায়রুহা নামক বাগানটি। তাই এটাই আমি আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিচ্ছি। আমি আশা করি যে, আখেরাতে এর সওয়াব পাব এবং এটা আমার জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। অতএব, আপনি এটা ঐ খাতে খরচ করে ফেলুন, যেখানে ব্যয় করা আপনি ভাল মনে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবাস! সাবাস! এটা তো খুবই উপকারী ও কাজের সম্পদ! আমি তোমার কথা শুনে নিয়েছি (এবং তোমার উদ্দেশ্যও বুঝে ফেলেছি।) আমি এটাই ভাল মনে করি যে, তুমি এটা তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ বন্টন করে দিয়ে দেবে। আবূ তালহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর আবূ তালহা এটা তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন রেওয়ায়তে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ) এ বাগানটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ অনুযায়ী নিজের বিশেষ ঘনিষ্ঠজন– উবাই ইবনে কাব, হাস্সান ইবনে সাবেত, শাদ্দাদ ইবনে আউস ও নবীত ইবনে জাবেরের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। এ বাগানটি কেমন মূল্যবান ছিল, এর অনুমান এর দ্বারা করা যায় যে, পরবর্তী সময়ে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কেবল হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের অংশটি এক লাখ দেরহাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন।

শিক্ষা ঃ যেহেতু মানুষের বেশী সম্পর্ক ও মাখামাখি নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথেই থাকে এবং অনেক লেন-দেনের প্রয়োজনও তাদের সাথেই পড়ে। এ জন্য মতবিরোধ ও ঝগড়াও আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেই বেশী হয়ে থাকে, যার দরুন এ দুনিয়ার জীবনটাও একটা আযাব হয়ে যায়, আর আখেরাতও ধ্বংস হয়ে যায়। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ শিক্ষা ও দর্শনের উপর আমল করা হয় এবং মানুষ আপন আত্মীয়-স্বজনের উপর নিজের উপার্জিত সম্পদ খরচ করাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম মনে করে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট আযাব ও অশান্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। হায়! পৃথিবীবাসী যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও হেদায়াতের মূল্য বুঝত এবং এর দ্বারা উপকৃত হত!

মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দান-সদাকা

সদাকা ও দান-খয়রাত কি? আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর এ নিয়্যতে ও এ আশায় অনুগ্রহ করা যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি, রহমত ও অনুগ্রহ লাভ হবে। আর নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্‌র রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ-অনুকম্পা লাভের একটা বিশেষ মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলে দিয়েছেন যে, যেভাবে একজন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করে এর বিনিময় ও সওয়াব আশা করতে পারে, তেমনিভাবে কোন মৃত ব্যক্তির

পক্ষ থেকে যদি সদাকা-খয়রাত করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এর সওয়াব ও প্রতিদান ঐ মৃত ব্যক্তিকে দান করেন। অতএব, মৃত ব্যক্তিদের খেদমত এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের একটি পদ্ধতি– তাদের জন্য দো'আ এস্তেগফার ছাড়া এটাও যে, তাদের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা হবে অথবা অন্য কোন নেক আমল করে এর সওয়াব তাদেরকে বখশিশ করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(৫৭) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ * (رواه البخارى ومسلم)

৫৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিবেদন করে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন। আমার ধারণা যে, তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বে কিছু বলতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই কিছু সদাকা করে যেতেন। তাই আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে কিছু দান-সদাকা করি, তাহলে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, পাবেন। —বুখারী, মুসলিম

(৫৮) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَيْئٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا * (رواه البخارى)

৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, সা'দ ইবনে উবাদার মা এমন সময় মারা গেলেন, যখন সা'দ বাড়ীতে ছিলেন না। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোন যুদ্ধ অভিযানে গিয়েছিলেন। যখন সেখান থেকে ফিরে আসলেন, তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা এন্তেকাল করে গিয়েছেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান-সদাকা করি, তাহলে এটা কি তার উপকারে আসবে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, উপকারে আসবে। সা'দ বললেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার মেখরাফ নামক বাগানটি তার নামে দান করে দিলাম। —বুখারী

(৫৯) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اَبِيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ * (رواه ابن جرير فى تهذيب الاثار)

৫৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং কিছু মাল রেখে গিয়েছেন। তবে (সদাকা ইত্যাদির কোন) ওসিয়্যত করে যান নি। তাই আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান-খয়রাত করি, তাহলে এটা কি তার কাফফারা ও গুনাহমাফীর কারণ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (আল্লাহ্র কাছে এটা আশা করা যায়।) —তাহযীবুল আছার

(٦٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَّنْحَرَ مِائَةَ بُدْنَةً وَاَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهٗ خَمْسِيْنَ وَاَنَّ عَمْرًوا سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَمَّا اَبُوْكَ لَوْ اَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهٗ ذَالِكَ * (رواه احمد)

৬০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তার দাদা আস ইবনে ওয়ায়েল জাহিলিয়্যত যুগে একশ' উট কুরবানী করার মান্নত করেছিল, (যা সে পূর্ণ করে যেতে পারে নি।) তার এক পুত্র হেশাম ইবনুল আস (তার পিতার ঐ মান্নতের হিসাবে) পঞ্চাশটি উট কুরবানী করে দিল, আর দ্বিতীয় পুত্র আমর ইবনুল আস (যিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ যদি তোমার পিতা তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে অথবা সদাকা করতে, তাহলে এটা তার উপকারে আসত। (কিন্তু কুফর ও শিরকের অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণে এখন আর তোমাদের কোন নেক আমল তার কাজে আসবে না।) —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদীসে একথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, দান-সদাকা ইত্যাদি যেসব নেক আমল কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা হয় অর্থাৎ, এর সওয়াব তাকে পৌছানো হয়, এগুলো তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে এবং এর সওয়াব তার কাছে পৌঁছে। বিষয়টি যেন এমন, যেভাবে এ দুনিয়াতে এক ব্যক্তি তার উপার্জিত টাকা-পয়সা আল্লাহ্র অন্য কোন বান্দাকে দান করে তার সেবা ও সাহায্য করতে পারে এবং সেই বান্দা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তেমনিভাবে যদি কোন ঈমানদার বান্দা তার পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন মু'মিন বান্দার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করে তাকে আখেরাতে উপকৃত করতে এবং তার খেদমত করতে চায়, তাহলে এসব হাদীস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এটা হতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর দরজা খোলা রয়েছে।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলার কি বিরাট দয়া ও অনুগ্রহ যে, এ পথে আমরা আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষীদের খেদমত তাদের মৃত্যুর পরেও করে যেতে পারি এবং নিজেদের হাদিয়া-উপঢৌকন সর্বদা তাদের কাছে পাঠাতে পারি।

এ মাসআলাটি হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং এর উপর উম্মতের ইমামদের ইজমা ও ঐকমত্যও রয়েছে। আমাদের যুগের এমন কিছু লোক– যারা হাদীসকে কুরআনের পর শরীঅতের দ্বিতীয় ভিত্তিমূল হিসাবেও স্বীকার করে না এবং এটাকে দ্বীনের দলীল হিসাবে মানতেও নারায, তারা এ মাসআলাটি অস্বীকার করে। এ অধম সংকলক এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগে এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক পুস্তিকা লিখেছিল। এতে এ মাসআলার প্রতিটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং সংশয়বাদীদের প্রতিটি সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ! পুস্তিকাটি এ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের জন্য যথেষ্ট।

কিতাবুয্ যাকাত আমরা এখানেই শেষ করে কিতাবুস সাওম শুরু করছি।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

কিতাবুস্ সাওম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের পর নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ হচ্ছে ইসলামের মূল উপাদান চতুষ্টয়। এই 'মা'আরিফুল হাদীস' সিরিজের একেবারে শুরুতেই ঐসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাঁচটি জিনিসকে ইসলামের আরকান ও ভিত্তিমূল বলে অভিহিত করেছেন। এ জিনিসগুলো ইসলামের আরকান ও মূল উপাদান হওয়ার মর্ম— যেমন আগেও উল্লেখ করা হয়েছে— এই যে, ইসলাম আল্লাহ্র আনুগত্যের যে জীবনধারার নাম, এ জীবন নির্মাণে এবং এর বিকাশ ও ক্রমোন্নয়ণে এ পাঁচটি জিনিসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নামায ও যাকাতের যে প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা স্বস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। রোযার এ প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা স্বয়ং কুরআন মজীদে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে করা হয়েছে। সূরা বাকারায় রমযানের রোযার ফরযিয়্যতের ঘোষণার সাথেই বলা হয়েছে ঃ "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ" অর্থাৎ, এ নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের মধ্যে যেন তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আধ্যাত্মিকতা ও পশুত্বের অথবা অন্য শব্দে এভাবে বলুন যে, ফেরেশ্তা চরিত্র ও পশু চরিত্রের এক সমন্বিত রূপ বানিয়েছেন। তার চরিত্র ও মূল সৃষ্টিতে ঐসব জৈবিক চাহিদাও রয়েছে যেগুলো অন্যান্য পশুদের মধ্যেও থাকে। আর এরই সাথে তার সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতা ও ফেরেশ্তা চরিত্রের ঐ নূরানী উপাদানও রয়েছে, যা ঊর্ধ্ব জগতের পবিত্র সৃষ্টি ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতা এর উপর নির্ভরশীল যে, তার এ আত্মিক ও ফেরেশ্তাসুলভ উপাদান যেন পশুসুলভ চরিত্রের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে এবং এটাকে যেন একটা সীমা রেখার নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন পশুত্বের দিকটি আত্মিক ও ফেরেশ্তা শক্তির দিকটির আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অবাধ্যতা না করে। রোযার সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এটাই যে, এর মাধ্যমে মানুষের পশু শক্তিকে আল্লাহ্র আহ্কামের অনুসরণ এবং আত্মিক ও ঈমানী দাবীসমূহের তাবেদারীতে অভ্যস্ত করে নেওয়া হবে। যেহেতু এ জিনিসটি নবুওয়াত ও শরীঅতের বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এ জন্য পূর্বেকার সকল শরীঅতেও রোযার বিধান সবসময় ছিল।

কুরআন মজীদে এ উম্মতকে রোযার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। (রোযার এ নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে,) যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা)

যাহোক, রোযা যেহেতু মানুষের পশুশক্তিকে তার ফেরেশ্তাশক্তির অধীনে রাখার এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধানের সামনে নফ্সের চাহিদা এবং উদর ও যৌন তাড়নার দাবীকে পরাস্ত করার একটি বিশেষ মাধ্যম, এ জন্য পূর্ববর্তী উম্মতসমূহকেও এর হুকুম দেওয়া হয়েছিল। যদিও রোযার সময়কাল এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিধি-বিধানে ঐসব উম্মতের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় কিছুটা পার্থক্যও ছিল। এ আখেরী উম্মতের জন্য– যার যুগ দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত– বছরে এক মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং রোযার সময় শেষ রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এ মেয়াদ ও এ সময়সূচী উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে এ যুগের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। কেননা, এর চেয়ে কম সময়ে সাধনা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। আর মেয়াদকাল যদি এর চেয়ে দীর্ঘ রাখা হত– যেমন, রোযার মধ্যে দিনের সাথে রাতকেও যুক্ত করে দেওয়া হত এবং কেবল সেহ্রীর সময় পানাহারের অনুমতি দেওয়া হত অথবা বছরে দু' চার মাস একাধারে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হত, তাহলে অধিকাংশ মানুষের জন্য এটা অসহনীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যেত। যাহোক, শেষ রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় এবং বছরে এক মাসের মুদ্দত এ যুগের সাধারণ মানুষের অবস্থা বিবেচনায় সাধনা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুবই উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ।

তারপর রোযার জন্য মাস নির্বাচন করা হয়েছে রমযানকে, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল এবং যে মাসে অসংখ্য রহমত ও বরকত সমৃদ্ধ একটি রাত (লায়লাতুল ক্বদর) থাকে। এ কথা স্পষ্ট যে, এ বরকতময় মাসটিই এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাছাড়া এ মাসে দিনের বেলার রোযা ছাড়া রাতের বেলায়ও একটি বিশেষ এবাদতের সাধারণ ও জামা'আতী ব্যবস্থাপনাও রাখা হয়েছে– যা 'তারাবীহ্' রূপে উম্মতের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। দিনের রোযার সাথে রাতের তারাবীহের বরকত যুক্ত হয়ে এ মাসের দীপ্তিময়তা ও প্রভাবে ঐ সংযোজন ঘটে, যা নিজেদের দৃষ্টি ও অনুভূতি অনুযায়ী প্রত্যেক ঐ বান্দাই অনুভব করতে পারে, যাদের এসব বিষয়ের সাথে কিছুটা সম্পর্ক ও পরিচয় রয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার রমযান ও রোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

মাহে রমযানের ফযীলত ও বরকত

(٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নেওয়া হয়। (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রখ্যাত মনীষী হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র পুণ্যবান ও অনুগত বান্দারা রমযানে যেহেতু আল্লাহ্র এবাদত ও পুণ্যকাজে অধিক মনোযোগী ও ব্যস্ত হয়ে যায়। তারা দিনের বেলায় রোযা রেখে যিকির ও তেলাওয়াতে সময় কাটায় এবং রাতের একটা বিরাট অংশ তারাবীহ্, তাহাজ্জুদ ও দো'আ এস্তেগফারে কাটিয়ে দেয়। আর তাদের এবাদতের নূর ও বরকতের প্রভাবে সাধারণ মু'মিনদের অন্তরও রমযান শরীফে এবাদত ও পুণ্যের দিকে বেশী আগ্রহী হয়ে উঠে এবং অনেক গুনাহ থেকে দূরে সরে থাকে। এ অবস্থায় ঈমান ও ইসলামের ভুবনে কল্যাণ ও তাক্ওয়ার এ ব্যাপক অনুরাগ এবং পুণ্য ও এবাদতের এ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারণে। ঐসব মানুষের অন্তরও যাদের মধ্যে সামান্য যোগ্যতাও রয়েছে– আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়। তাছাড়া এ মুবারক মাসে সামান্য নেক কাজের মূল্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই এর ফল এই হয় যে, ঐসব লোকদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যায়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তান তদেরকে পথভ্রষ্ট করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে যায়।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই তিনটি বিষয়ের (অর্থাৎ, জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শয়তানকে বন্দী করে নেওয়ার) সম্পর্ক ঐসব মু'মিনদের সাথে, যারা রমযানে কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় এবং রমযানের রহমত ও বরকত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র এবাদত ও আনুগত্যকে নিজের কাজ বানিয়ে নেয়। বাকী রইল ঐসব কাফের, খোদাবিমুখ ও উদাসীনতায় অভ্যস্ত লোকেরা, যারা রমযান এবং এর বিধি-বিধান ও বরকতের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং রমযানের আগমনে তাদের জীবনে কোন পরিবর্তনই আসে না। একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের সুসংবাদের তাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তারা যখন নিজেরাই নিজেদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছে এবং বার মাসই শয়তানের আনুগত্য করে নিশ্চিন্তে বসে আছে, তখন আল্লাহ্র কাছেও তাদের জন্য বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে ?

(٦٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ * (رواه الترمذى وابن ماجة)

৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও দুষ্ট জিনদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এগুলোর কোন দরজাই খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং এগুলোর কোন দরজাই বন্ধ রাখা হয় না। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা দিতে থাকে ঃ হে

contents

কল্যাণপ্রত্যাশী! তুমি সামনে অগ্রসর হও আর হে মন্দের অন্বেষী! থেমে যাও। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনেক (গুনাহগার) বান্দার জাহান্নাম মুক্তি রয়েছে। (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমার ফায়সালা করা হয়।) আর এটা রমযানের প্রতি রাতেই অব্যাহত থাকে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের প্রথমাংশের বিষয়বস্তু তো তাই, যা এর পূর্বের হাদীসের ছিল। শেষের দিকে অদৃশ্য জগতের ঘোষণাকারীর যে ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে, যদিও আমরা এটা আমাদের কান দিয়ে শুনি না এবং শোনা সম্ভবও নয়; কিন্তু এর এ প্রভাব ও প্রকাশ আমরা এ দুনিয়াতেও নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করি যে, রমযান শরীফে সাধারণভাবে ঈমানদারদের ঝোক ও আকর্ষণ কল্যাণ ও সৌভাগ্য আনয়নকারী আমলের দিকে বেড়ে যায়। এমনকি অনেক অসতর্ক ও লাগামহীন সাধারণ মুসলমানও রমযানে তাদের আচরণ ও কর্মনীতি কিছুটা পরিবর্তন করে নেয়। আমাদের দৃষ্টিতে এটা উর্ধ্বজগতের ঐ আহ্বানেরই বহিঃপ্রকাশ ও এরই প্রভাব।

(٦٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ كَانَ جِبْرَئِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ বিতরণে এবং মানুষের উপকার সাধনে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর তাঁর এ বদান্যতার গুণটি রমযানে আরো বৃদ্ধি পেত। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রমযানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআন শুনাতেন। জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ বিতরণে মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেশী অগ্রগামী হয়ে যেতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রমযানের মাসটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-প্রকৃতির জন্য বসন্ত ও আনন্দের এবং কল্যাণ বিতরণ গুণে উন্নতির মাস ছিল। আর এতে এ জিনিসটিরও দখল ছিল যে, এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বার্তাবাহক হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করতেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শুনাতেন।

রমযানের আগমনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ভাষণ

(٦٤) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا

سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِى شَرْبَةً لَايَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ٭ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৬৪। হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের উপর একটি মহান বরকতময় মাস ছায়াপাত করেছে। এ মাসে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসের রোযাকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন, আর রাতের কেয়ামকে (তারাবীহকে) নফল এবাদত নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মাসে কোন কল্যাণকর্ম (সুন্নত অথবা নফল এবাদত) করবে, সে অন্য মাসের একটি ফরয এবাদতের সমান সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে, সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমান সওয়াব পাবে। এটা ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। এটা সহানুভূতির মাস, এ মাসে মু'মিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির ফায়সালা করে দেওয়া হয়। তাকে রোযাদারের সমান সওয়াবও দান করা হয়, তবে এতে রোযাদারের সওয়াবের কোন ঘাটতি আসবে না। আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সবার তো আর ইফতার করানোর মত সামর্থ্য নেই, (তাই গরীবরা কি এ বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে?) তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ সওয়াব ঐ ব্যক্তিকেও দান করবেন, যে কোন রোযাদারকে এক চুমুক দুধ অথবা এক ঢোক পানি দিয়েও ইফতার করিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেট ভরে আহার করাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার হাউয (কাওছার) থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে, জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত তার আর কোন পিপাসাই হবে না। এটা এমন মাস, যার প্রথম অংশ রহমত, মধ্য ভাগ মাগফেরাত আর শেষ ভাগ জাহান্নাম মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের গোলাম ও চাকরের কাজ হাল্কা করে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভাষণটির মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবুও এর কয়েকটি অংশের মর্মকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য কিছু নিবেদন করা হচ্ছে ঃ

(১) এ ভাষণে রমযান মাসের সবচেয়ে বড় ফযীলত ও মাহাত্ম্য এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার দিন ও হাজার রাত নয়; বরং হাজার মাস থেকে উত্তম। একথাটি কুরআন মজীদের সূরা ক্বদরে বলা হয়েছে; বরং এ সম্পূর্ণ সূরাটিতে এ বরকতময় রজনীর মাহাত্ম্য ও ফযীলতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ রাতের মর্যাদা, ফযীলত ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এ বিষয়টিই যথেষ্ট।

এক হাজার মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার রাত হয়। এ লায়লাতুল ক্বদর এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হওয়ার অর্থ এ বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কধারী এবং তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী বান্দারা এ এক রাতে আল্লাহ্র নৈকট্যের এতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, যা অন্য হাজার হাজার রাতেও অতিক্রম করা যায় না। আমরা যেভাবে এ বস্তু জগতে প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, দ্রুতগামী বিমান অথবা রকেটের মাধ্যমে বর্তমানে এক দিনে; বরং এক ঘন্টায় এর চেয়ে বেশী দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, যা প্রাচীন যুগে বহু বছরেও অতিক্রম করা সম্ভব হত না। তেমনিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের সফরের গতি এ লায়লাতুল ক্বদরে এত দ্রুত করে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ প্রেমিকদের যে বিষয়টি হাজার মাসেও অর্জিত হতে পারে না সে বিষয়টি এ এক রাতে অর্জিত হয়ে যায়।

এরই আলোকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার মর্মও বুঝতে হবে যে, এ মুবারক মাসে যে ব্যক্তি কোন নফল আমল করবে, এর সওয়াব ও প্রতিদান অন্য সময়ের ফরয আমলের সমান পাওয়া যাবে। আর ফরয আমলকারী অন্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায় করার সওয়াব পাবে। মনে হয় যে, লায়লাতুল ক্বদরের বৈশিষ্ট্য তো রমযানের একটি বিশেষ রাতের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু পুণ্যের সওয়াব সত্তর গুণ লাভ করা রমযানের প্রতিটি দিন ও রাতের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ বাস্তব বিষয়সমূহের বিশ্বাস ও ইয়াকীন নছীব করুন এবং এগুলো থেকে লাভবান ও উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন।

(২) এ ভাষণে রমযান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা ধৈর্য ও সহানুভূতির মাস। ধর্মীয় পরিভাষায় সবর ও ধৈর্যের আসল অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফ্সের খাহেশকে দমন করা এবং তিক্ততা ও কষ্ট স্বীকার করা। এ কথা স্পষ্ট যে, রোযার শুরু ও শেষ মূলত এটাই। অনুরূপভাবে রোযা রেখে প্রতিটি রোযাদারই বুঝতে পারে যে, অভুক্ত থাকা কেমন কষ্টের জিনিস। তাই এর দ্বারা তার মধ্যে ঐসব গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি হওয়া উচিত, যারা নিঃস্ব হওয়ার কারণে নিত্য উপোস করে দিন কাটায়। এ দৃষ্টিতে রমযান মাস নিঃসন্দেহে ধৈর্য ও সহানুভূতির মাস।

(৩) এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, এ বরকতময় মাসে মু'মিনদের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর অভিজ্ঞতা তো প্রতিটি মু'মিন রোযাদারের রয়েছে যে, রমযান মাসে যতটুকু ভাল ও তৃপ্তির খাবার ভাগ্যে জুটে, বছরের অন্য এগার মাসে এতটুকু জুটে না। এ উপকরণ জগতে সেটা যে পথেই আসুক, সবকিছু আল্লাহ্রই হুকুমে এবং তাঁরই ফায়সালায় এসে থাকে।

(৪) ভাষণের শেষে বলা হয়েছে যে, রমযানের প্রথম অংশটি রহমতের, দ্বিতীয় অংশটি মাগফেরাতের আর শেষ অংশটি জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের সময়।

এ অধম সংকলকের নিকট এর প্রাধান্যশীল ও বেশী মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, রমযানের বরকত দ্বারা উপকার লাভকারী মানুষ তিন ধরনের হতে পারে ঃ (১) ঐসব পুণ্যবান ও মুত্তাকী

বান্দা, যারা সবসময় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং যখনই তাদের পক্ষ থেকে কোন গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই তওবা-এস্তেগফার করে তারা অন্তর পরিষ্কার করে নেয় এবং এর ক্ষতিপূরণ করে নেয়। এসব বান্দাদের উপর তো শুরু মাস থেকেই; বরং এর প্রথম রাত থেকেই আল্লাহ্র রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। (২) দ্বিতীয় শ্রেণী ঐসব লোকদের, যারা এমন মুত্তাকী ও পরহেযগার তো নয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে একেবারে অধপতিতও নয়। এসব লোক যখন রমযানের প্রথমাংশে রোযা ও অন্যান্য নেক আমল এবং তওবা-এস্তেগফার দ্বারা নিজেদের অবস্থাকে ভাল এবং নিজেদেরকে রহমত ও মাগফেরাতের যোগ্য বানিয়ে নেয়, তখন দ্বিতীয় অংশে তাদেরও মাগফেরাত ও ক্ষমার ফায়সালা করে দেওয়া হয়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীটি ঐসব লোকদের, যারা নিজেদের উপর খুবই জুলুম করেছে, যাদের অবস্থা খুবই অধপতিত এবং নিজেদের কুকর্মের দরুন তারা যেন জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারাও যখন রমযানের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাধারণ মুসলমানদের সাথে রোযা রেখে এবং তওবা-এস্তেগফার করে নিজেদের পাপাচারের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে নেয়, তখন শেষ দশকে (যা আল্লাহ্র রহমতের দরিয়ায় ঢেউ জাগার দশক) আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে তাদেরও মুক্তির ফায়সালা করে দেন।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে "রমযান শরীফের প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাত ও তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের" কথাটির সম্পর্ক থাকবে উপরের বিন্যাস অনুযায়ী উম্মতে মুসলিমার ঐ তিনটি শ্রেণীর সাথে।

রোযার মূল্য ও এর প্রতিদান

(٦٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রোযার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, এ উম্মতের নেক আমলসমূহের বেলায় আল্লাহ্র সাধারণ নীতি এই যে, একটি পুণ্যের প্রতিদান পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় কমপক্ষে দশগুণ দেওয়া হবে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এর চাইতেও বেশী দেওয়া হবে। এমনকি কোন কোন মকবূল বান্দাকে তাদের পূণ্যকর্মের প্রতিদান সাতশ'গুণ পর্যন্ত দেওয়া হবে। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এ সাধারণ রহমত নীতির উল্লেখ করেছেন।) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ রোযা এ সাধারণ নীতির বাইরে ও উর্ধ্বে। কেননা, এটা আমারই জন্য এবং আমি (যেভাবে ইচ্ছা) এর প্রতিদান দিব। আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফ্সের চাহিদা ও পানাহার ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী

রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়ে বেশী সুগন্ধময়। (অর্থাৎ, মানুষের কাছে মেশকের সুগন্ধি যতটুকু প্রিয় মনে হয়, আল্লাহ্র কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ এর চেয়ে বেশী প্রিয়।) আর রোযা হচ্ছে (নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার) ঢাল। তোমাদের কারো যখন রোযার দিন হয়, তখন সে যেন অশ্লীল কথা-বার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তাহলে সে যেন বলে দেয় যে, আমি রোযাদার। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির অধিকাংশ ব্যাখ্যাযোগ্য অংশের ব্যাখ্যা অনুবাদের ভিতরই করে দেওয়া হয়েছে। শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ "কারো যখন রোযার দিন হয়, তখন সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অহেতুক শোরগোল না করে। আর যদি অন্য কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মাতামাতি করতে আসে, তাহলেও সে যেন কটুকথা না বলে; বরং এ কথা বলে দেয় যে, ভাই! আমি তো রোযাদার।" এ শেষ উপদেশে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ হাদীসে রোযার যে বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো কেবল ঐ রোযার, যার মধ্যে প্রবৃত্তি দমন ও পানাহার বর্জন ছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ– এমনকি মন্দ ও অপছন্দনীয় কথা-বার্তাও পরিহার করে চলা হয়। অন্য এক হাদীসে (যা একটু পরেই আসবে।) বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি রোযা রাখে, কিন্তু মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে না, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।

(٦٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বিশেষ দরজা রয়েছে, যাকে 'রাইয়্যান' বলা হয়। এ দরজা দিয়ে কেয়ামতের দিন কেবল রোযাদাররাই প্রবেশ করবে, তাদের ছাড়া অন্য কেউই এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সে দিন বলা হবে ঃ রোযাদাররা কোথায়? এ ডাক শুনে তারা দাঁড়িয়ে যাবে, তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। রোযাদাররা যখন এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারপর কেউ আর এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রোযার মধ্যে যে কষ্টটি সবচেয়ে বেশী অনুভব হয় এবং রোযাদার যে জিনিসটির বেলায় বেশী ত্যাগ স্বীকার করে সেটা হচ্ছে তার পিপাসিত থাকা। এ জন্য তাকে যে পুরস্কার ও প্রতিদান দেওয়া হবে, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রধান দিকটি তৃপ্তি ও সজীবতার হওয়া চাই। এ রহস্যের কারণে জান্নাতে রোযাদারদের প্রবেশের জন্য যে বিশেষ দরজাটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তৃপ্তি ও প্রাণের সজীবতা। 'রাইয়্যান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পূর্ণ তৃপ্তি। এ পরিপূর্ণ তৃপ্তি তো হচ্ছে ঐ দরজার বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে রোযাদাররা জান্নাতে

প্রবেশ করবে। সামনে জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব নেয়ামত তারা লাভ করবে, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ রোযা আমার জন্যই এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।

(٦٧) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِاَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللّٰهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ * (رواه النسائى)

৬৭। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের নির্দেশ দিন, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন ঃ তুমি রোযা রেখে যাও, কেননা, এর তুল্য কোন আমল নেই। —নাসায়ী।

ব্যাখ্যা ঃ নামায, রোযা, দান-খয়রাত, হজ্জ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্মসমূহে যদিও একটি বিষয় সমানভাবে বিদ্যমান যে, এর সবগুলোই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, কিন্তু এগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও রয়েছে– যার কারণে একটি আরেকটি থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও ভিন্নধর্মী। যেমন বলা হয় ঃ প্রতিটি ফুলের রং ও ঘ্রাণ ভিন্ন। এ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই বলা যায় যে, এর তুল্য আর কোন আমল নেই। যেমন, প্রবৃত্তি দমন ও এর চাহিদাসমূহকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রোযার মত অন্য কোন আমল নেই। অতএব, হযরত আবূ উমামার এ হাদীসে রোযা সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'এর তুল্য কোন আমল নেই' এর অর্থ এটাই বুঝতে হবে। তাছাড়া এ কথাও মনে রাখা চাই যে, হযরত আবূ উমামার নিজের অবস্থা বিবেচনায় তার জন্য বেশী উপকারী আমল রোযাই ছিল। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ হাদীসের অন্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আবূ উমামা এ উত্তর পাওয়ার পর দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয়বারও এ নিবেদনই করলেন, 'আমাকে কোন আমলের কথা বলুন, যা আমি করে যাব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রতিবারই বললেন ঃ রোযা রেখে যাও, এর তুল্য অন্য কোন আমল নেই। অর্থাৎ, তোমার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বারাই তোমার বেশী উপকার হবে।

রোযা এবং তারাবীহ্ ক্ষমা লাভের উপায় হয়

(٦٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় রমযানের রাতে এবাদত (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আদায়) করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ

করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবীতে এবং পুণ্যের প্রত্যাশায় শবে ক্বদরে নফল এবাদত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রমযানের রোযা, এর রাতের নফল এবাদত এবং বিশেষ করে শবে ক্বদরের নফল এবাদতকে অতীতের গুনাহমাফীর নিশ্চিত ওসীলা বলা হয়েছে। তবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এগুলো ঈমান ও এহ্তেসাবের সাথে হতে হবে। এ ঈমান ও এহ্তেসাব একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিভাষা। এর অর্থ এই যে, যে কোন নেক আমল করা হবে এর ভিত্তি এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়টি হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান, তাদের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিবাণীর প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত প্রতিদানের আশা। অন্য কোন উদ্দেশ্য ও আবেগ এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হবে না। এ ঈমান ও এহ্তেসাবের দ্বারাই আমাদের আমলের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে স্থাপিত হয়; বরং এ ঈমান ও এহতেসাবই আমাদের আমলসমূহের আত্মা ও প্রাণ। যদি এটা না থাকে, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরাট মনে হলেও এ আমল প্রাণহীন ও অন্তঃসার শূন্যই গণ্য হবে– যা কেয়ামতের দিন অচল মুদ্রা প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে ঈমান ও এহতেসাবের সাথে বান্দার একটি সাধারণ আমলও আল্লাহ্র কাছে এত প্রিয় ও মূল্যবান যে, এর বরকতে অনেক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে ঈমান ও এহতেসাবের এ গুণ নছীব করুন।

রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে

(٦٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ الْعَبْدَ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ٭ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ বান্দাকে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছিলাম। তাই তার বেলায় আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম। অতএব, তুমি তার বেলায় আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। তাই উভয়ের সুপারিশ কবূল করা হবে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ কত বড় ভাগ্যবান ঐসব বান্দা, যাদের বেলায় তাদের রোযা এবং কুরআনের সুপারিশ কবূল করা হবে– যে কুরআন তারা তারাবীহ ও নফল নামাযে পাঠ করেছিল অথবা শ্রবণ করেছিল। এটা তাদের জন্য কেমন আনন্দ ও খুশীর সময় হবে।

রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়

(٧٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَامَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَاِنْ صَامَهٗ ٭ (رواه احمد)

৭০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ওযর ও অবকাশ এবং অসুস্থতার কারণ ছাড়া রমযানের একটি রোযা

ছেড়ে দিল, সে পরবর্তীতে সারা জীবন রোযা রাখলেও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। —মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ইমাম বুখারীও হাদীসটি একটি তরজুমাতুল বাবে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির দাবী ও মর্ম এই যে, শরীঅতসম্মত ওযর ও অবকাশ ছাড়া রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিলে রমযানের বিশেষ বরকত ও আল্লাহ্র খাছ রহ্মত থেকে মানুষ এতদূর বঞ্চিত হয় যে, সারা জীবন রোযা রাখলেও এর ক্ষতিপূরণ হয় না। একটি রোযার আইনগত কাযা যদিও এক দিনের রোযাই; কিন্তু এর দ্বারা ঐ জিনিসটি আর লাভ হবে না, যা রোযা ছেড়ে দেওয়ার কারণে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। অতএব, যেসব লোক বেপরোয়া হয়ে রমযানের রোযা ছেড়ে দেয় তারা একটু চিন্তা করে দেখুক যে, নিজেদের কী ক্ষতি তারা করে চলেছে।

রোযা রেখে গুনাহ্ থেকে সতর্ক থাকা

(٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ * (رواه البخارى)

৭১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথন ও অন্যায় কাজ পরিহার করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রোযা মকবূল ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটা জরুরী যে, মানুষ পানাহার বর্জন ছাড়া গুনাহ্ ও অশ্লীল কথা ও কাজ থেকেও নিজের মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করবে। যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখে আর গুনাহর কথা-বার্তা ও গুনাহর কাজ করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার এ রোযার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

রমযানের শেষ দশক ও শবে কদর

অন্যান্য মাসের তুলনায় যেমন রমযানের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, তেমনিভাবে এর শেষ দশক প্রথম দুই দশক থেকে উত্তম এবং শবে কদর অধিকাংশ সময় এ দশকেই হয়ে থাকে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দশকে এবাদত-মুজাহাদা আরো বেশী করতেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন।

(٧٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ * (رواه مسلم)

৭২। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এমন এবাদত ও মুজাহাদা করতেন– যা অন্য দিনগুলোতে করতেন না। —মুসলিম

(٧٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَاَحْىٰ لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ * (رواه البخارى ومسلم)

৭৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক এসে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমর বেঁধে নিতেন, সারা রাত জাগ্রত থাকতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। —বুখারী, মুসলিম

(৭٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ * (رواه البخارى)

৭৪। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তোমরা শবে ক্বদরের অনুসন্ধান কর। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, শবে ক্বদর বেশীর ভাগ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতসমূহের মধ্যে কোন এক রাতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতে। শবে ক্বদর যদি এভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত যে, এটা বিশেষ করে অমুক রাত, তাহলে অনেক মানুষ কেবল এ রাতেই এবাদত-বন্দেগী করত। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে এমনভাবে অস্পষ্ট রেখেছেন যে, কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ কুরআন শবে ক্বদরে নাযিল হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ কুরআন অবতরণ রমযান মাসে শুরু হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, ঐ শবে ক্বদর রমযানের কোন রাত ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বললেন ঃ রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে এর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঐ রাতগুলোর ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া চাই। এ বিষয়ের অনেক হাদীস হযরত আয়েশা ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের পক্ষ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর কোন কোন সাহাবীর ধারণা ছিল যে, শবে ক্বদর সাধারণতঃ রমযানের সাতাশতম রাতই হয়ে থাকে।

(৭৫) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَرَادَ اَنْ لَايَتَّكِلَ النَّاسُ اَمَا اِنَّهُ قَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ وَاَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَايَسْتَثْنِىْ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِاَىِّ شَيْئٍ تَقُوْلُ ذَالِكَ يَااَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ اَوْقَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَاشُعَاعَ لَهَا * (رواه مسلم)

৭৫। যির ইবনে হুবাইশ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার দ্বীনি ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ তো বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছরের রাতগুলোতে এবাদত করবে, সে শবে কদর পেয়ে যাবে। (অর্থাৎ, শবে ক্বদর বছরের কোন এক রাতে হয়ে থাকে। তাই এটা পেতে হলে সারা বছরই প্রতি রাতে এবাদত করতে হবে এবং এভাবেই নিশ্চিত শবে ক্বদর লাভ করা যাবে। তাই এ ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।) উবাই বললেন, ইবনে মাসঊদকে আল্লাহ্ রহম করুন। তার

উদ্দেশ্য এ ছিল যে, মানুষ যেন (কেবল এক রাতের এবাদতের উপর) নির্ভর করে বসে না থাকে। অন্যথায় তিনি একথা ভালভাবেই জানেন যে, শবে ক্বদর রমযানেই হয়ে থাকে এবং এটা শেষ দশকে থাকে, আর এটা সাতাশতম রাতেই নির্ধারিত। তারপর তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বললেন যে, এটা সাতাশতম রাতই। যির ইবনে হুবাইশ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবুল মুনযির। এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ লক্ষণের ভিত্তিতে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। আর সেটা হচ্ছে এই যে, শবে ক্বদরের প্রভাতে যখন সূর্য উঠে, তখন তার কিরণ স্বাভাবিক থাকে না। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)-এর উত্তর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি যে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলেছেন যে, শবে ক্বদর নির্দিষ্টভাবে সাতাশতম রাতেই হয়, একথা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেননি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে একটি লক্ষণ বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেহেতু এ লক্ষণ ও আলামতটি সাধারণতঃ সাতাশতম রাতের সকালেই দেখেছিলেন, এ জন্য প্রত্যয়ের সাথে তিনি এ মত পোষণ করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তো এই বলেছেন যে, রমযানের শেষ দশ দিনে এর অনুসন্ধান কর, কখনো বলেছেন, শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর, আবার কখনো শেষ দশকের পাঁচটি বিজোড় রাতের চার অথবা তিন রাতের কথা বলেছেন। কোন বিশেষ রাতকে তিনি নির্দিষ্ট করে দেননি। হ্যাঁ, অনেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা এই যে, এটা প্রায়ই সাতাশতম রাতেই হয়ে থাকে। শবে ক্বদরকে এভাবে অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যে হেকমত ও রহস্য এটাই যে, একটিমাত্র রাতের জন্য বসে না থেকে আল্লাহ্প্রেমিক বান্দারা যেন বিভিন্ন রাতে এবাদত, যিকির ও দো'আয় মশগুল থাকে। যারা এমন করবে, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

(٧٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭৬। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন শবে ক্বদর আসে, তখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ফেরেশ্তাদের একটি কাফেলা নিয়ে অবতরণ করেন এবং তারা প্রত্যেক ঐ বান্দার জন্য দো'আ করেন, যারা দাঁড়িয়ে অথবা বসে আল্লাহ্র এবাদত ও যিকিরে মশগুল থাকে। —বায়হাকী

শবে ক্বদরের বিশেষ দো'আ

(٧٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

৭৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলে দিন, আমি যদি

জানতে পারি যে, শবে ক্বদর কোন্ রাত, তাহলে আমি সেই রাতে কি দো'আ পড়ব ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি বল ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু, আর ক্ষমা তুমি পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। —আহ্মাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অনেক বান্দাদের এ অভ্যাস দেখা যায় যে, তারা প্রতি রাতেই বিশেষভাবে এ দো'আটি করে থাকেন। আর রমযানের রাতগুলোতে– আর এগুলোর মধ্যে থেকে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে এ দো'আর ব্যাপারে তারা আরো বেশী যত্নশীল থাকেন।

রমযানের শেষ রাত

(٧٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهٖ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهُ اِذَا قَضٰى عَمَلَهُ *

(رواه احمد)

৭৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের শেষ রাতে তাঁর উম্মতের ক্ষমার ফায়সালা করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শবে ক্বদর ? তিনি উত্তর দিলেন, শবে ক্বদর তো নয়, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এই যে, কোন আমলকারীকে তার পূর্ণ প্রতিদান তখনই দেওয়া হয়, যখন সে তার কাজ সমাপ্ত করে নেয়। —মুসনাদে আহ্মাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রমযান শরীফের শেষ রাতটিও বিশেষ মাগফেরাত লাভের রাত। তবে এ রাতে মাগফেরাত ও ক্ষমার ফায়সালা ঐসব বান্দাদের জন্যই হবে, যারা রমযানের বাস্তব দাবীসমূহ কোন না কোন পর্যায়ে পূরণ করে এ ক্ষমার অধিকার অর্জন করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন।

এ'তেকাফ প্রসঙ্গ

রমযান শরীফের– বিশেষ করে এর শেষ দশ দিনের আমলসমূহের মধ্যে একটি আমল হচ্ছে এ'তেকাফ। এ'তেকাফের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, একজন বান্দা সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে এবং সবাইকে ছেড়ে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন হয়ে তাঁর দরজায় (অর্থাৎ, মস্জিদের এক কোণে) পড়ে থাকবে এবং নিরিবিলি পরিবেশে তাঁর এবাদত ও যিকিরে লিপ্ত থাকবে। এটা আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের; বরং তাদের মধ্যে যারা উঁচু পর্যায়ের– তাদের এবাদত। এ এবাদতের উত্তম সময় রমযান শরীফ এবং বিশেষভাবে রমযানের শেষ দশকই হতে পারত। এ জন্য এ সময়টাকেই এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সবার নিকট থেকে পৃথক হয়ে নীরবে নির্জনে আল্লাহ্র এবাদত ও যিকিরের যে ব্যাকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে তিনি একাধারে কয়েক মাস পর্যন্ত হেরার গুহায় নির্জনবাস করতে থাকলেন, এটা যেন তাঁর প্রথম এ'তেকাফ ছিল। আর এ এ'তেকাফের দ্বারা তাঁর আত্মিক শক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, এখন তাঁর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়ে যেতে পারে।

বস্তুতঃ হেরা গুহার এ এ'তেকাফের শেষ দিনগুলোতেই আল্লাহ্‌র ওহীবাহক ফেরেশ্‌তা হযরত জিবরাঈল সূরা 'আলাক'-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো নিয়ে আগমন করলেন। সঠিক অনুসন্ধান অনুযায়ী এটা রমযানের মাস ও এর শেষ দশক ছিল এবং ঐ রাতটি শবে ক্বদর ছিল। এ কারণেও এ'তেকাফের জন্য রমযান শরীফের শেষ দশককে নির্বাচন করা হয়েছে।

আত্মার লালন ও এর উন্নতি এবং জৈবিক শক্তির উপর এটাকে প্রবল ও বিজয়ী রাখার জন্য রমযানের সারা মাসের রোযা তো উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ফরয করা হয়েছে। এভাবে যেন নিজের অন্তরে ফেরেশ্‌তা শক্তিকে বিজয়ী ও পশু-চরিত্রকে দমন করার জন্য এতটুকু সাধনা ও নফ্‌সের এতটুকু কুরবানীকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও তাঁর এবাদতের নিয়্যতে দিনের বেলায় পানাহার না করে, স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকে এবং সর্বপ্রকার গুনাহর কাজ– এমনকি অহেতুক কথাবার্তাও বর্জন করে চলে, আর এ নিয়মেই সারাটি মাস অতিবাহিত করে। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে রমযানে আত্মার লালন ও এর পরিশুদ্ধির একটি সাধারণ ও বাধ্যতামূলক কোর্স। এর চেয়ে আরো উঁচু পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এ'তেকাফের রীতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ'তেকাফকালে একজন মানুষ সবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সকলের নিকট থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে আপন মালিক ও মাওলার ঘরে এবং যেন তাঁরই পদপ্রান্তে পড়ে থাকে, তাঁকেই স্মরণ করে, তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকে, তারই তসবীহ ও প্রশংসা করে, তাঁর দরবারে তওবা-এস্তেগফার করে, নিজের অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহ খাতার জন্য কান্নাকাটি করে, দয়াময় মালিকের কাছে রহমত ও মাগফেরাত প্রার্থনা করে, তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করে। এভাবেই তার দিন কাটে এবং এ অবস্থায়ই তার রাত চলে। আর একথা স্পষ্ট যে, এর চেয়ে সৌভাগ্য একজন বান্দার আর কী হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর খুবই যত্ন ও গুরুত্বসহকারে রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন। এমন কি এক বছরে যখন কোন কারণে এ'তেকাফ ছুটে গেল, তখন পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করলেন। এ ভূমিকার পর এবার এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস পাঠ করে নিন ঃ

(٧٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

৭৯। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন। তাঁর এ রীতি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রীগণও এ'তেকাফ করেছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ নিজেদের হুজরায় এ'তেকাফ করতেন, আর মহিলাদের জন্য এ'তেকাফের স্থান হচ্ছে তাদের ঘরের ঐ জায়গাটিই, সাধারণত যা তারা নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। আর যদি ঘরে নামাযের কোন স্থান নির্ধারিত না থাকে, তাহলে এ'তেকাফকারী মহিলাগণ গৃহের যে কোন একটি স্থান নির্বাচন করে নিবে।

(٨٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ * (رواه الترمذى)

৮০। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন। এক বছর তিনি এ'তেকাফ করতে পারলেন না। তাই পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করে নিলেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে এ কথার কোন উল্লেখ নেই যে, এক বছর এ'তেকাফ না করতে পারার কারণ কি ছিল। তবে নাসায়ী ও আবূ দাউদ শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এক বছর রমযানের শেষ দশকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন এক সফরে যেতে হয়েছিল। এ কারণে তিনি এ'তেকাফ করতে পারেন নি। তাই পরের বছর তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করেছিলেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে বছর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তেকাল করেন, সে বছরও তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করেছিলেন। এ বিশ দিনের এ'তেকাফ সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, তিনি ইঙ্গিতে জানতে পেরেছিলেন যে, অচিরেই তাঁকে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এ জন্য এ'তেকাফের মত আমলের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বভাবজাত ব্যাপার ছিল। কেননা, মিলনের প্রতিশ্রুতি যখন নিকটে এসে যায়, তখন হৃদয়ের উত্তাপও তীব্রতর হয়ে উঠে।

(٨١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَيَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ * (رواه ابوداؤد)

৮১। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ'তেকাফকারীর জন্য সুন্নত ও শরীঅতের বিধান হচ্ছে এই যে, সে রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বাইরে যাবে না, স্ত্রী-সম্ভোগ করবে না এবং আবেগঘন স্পর্শ ও চুম্বনও করবে না। সে নিজের প্রয়োজনের জন্যও মসজিদের বাইরে যাবে না, তবে ঐসব প্রয়োজনের কথা ভিন্ন, যেগুলো পুরণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, (যেমন, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি।) আর (এ'তেকাফ রোযা অবস্থায় হওয়া চাই।) রোযা ছাড়া এ'তেকাফ নেই। এ'তেকাফ জামাআতের মসজিদে হওয়া চাই, এর বাইরে নয়। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মা'আরিফুল হাদীসে এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ যদি বলেন, 'সুন্নত-রীতি হচ্ছে এই' তাহলে এর অর্থ এই হয় যে, এটা শরীঅতের বিধান এবং এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এ মাসআলাটি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অথবা কর্মধারা থেকে জেনেছেন। এ জন্য এটা 'মারফূ' হাদীসের মধ্যেই গণ্য হয়। এ ভিত্তিতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে এ'তেকাফের যে মাসআলাগুলো

বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য হিসাবেই গণ্য হবে।

হাদীসের শেষে 'মসজিদে জামে' বলে যে শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা জামাআতের মসজিদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নিয়মিত জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এ'তেকাফের জন্য রোযাও শর্ত এবং জামাআতের মসজিদ হওয়াও শর্ত।

(٨٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيَجْرِىْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا * (رواه ابن ماجة)

৮২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ'তেকাফকারীর ব্যাপারে বলেছেন ঃ সে (এ'তেকাফের কারণে এবং মসজিদে বন্দী হয়ে যাওয়ার দরুন) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং পুণ্য অর্জনকারীদের মত পুণ্য তার জন্যও অব্যাহত থাকে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ যখন একজন বান্দা এ'তেকাফের নিয়্যতে নিজেকে মসজিদে বন্দী করে নেয়, তখন সে যদিও এবাদত, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের পুণ্যের মধ্যে নতুন নতুন সংযোজন ঘটায়; কিন্তু অনেক বড় বড় পুণ্যের কাজ থেকে সে অক্ষম ও অপারগও হয়ে যায়। যেমন, সে রোগীদের সেবা করতে পারে না — যা বিরাট পুণ্যের কাজ। অনুরূপভাবে সে কোন অসহায়, মিসকীন, ইয়াতীম ও বিধবার সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করতে পারে না, কোন মুর্দাকে গোসল দিতে পারে না— যা সওয়াবের নিয়্যতে এবং এখলাছের সাথে করা হলে বিরাট প্রতিদান লাভের ওসীলা হয়। তদ্রূপভাবে সে জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বাইরে যেতে পারে না– মৃত ব্যক্তিকে দাফনের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যেতে পারে না– যেখানে গেলে প্রতি কদমে গুনাহ মাফ হয় এবং সওয়াব লিখা হয়। কিন্তু এ হাদীসে এ'তেকাফকারীকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে ঐসব পুণ্যও লিখে দেওয়া হয়, এ'তেকাফের কারণে যেগুলো করতে সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে যায়, অথচ অন্য সময় সে এগুলো করতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহু আকবার! কত বড় সৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জনের কত বিরাট সুযোগ।

চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ

ইসলামী শরীঅত বিশেষ আমল ও এবাদতসমূহের জন্য যে বিশেষ সময় অথবা দিন তারিখ অথবা সময়কাল নির্ধারণ করেছে, এগুলো নির্ধারণ করার সময় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, এ সময় অথবা দিন অথবা সময়কালকে জানার জন্য যেন কোন বিদ্যা, কোন দর্শন অথবা কোন যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয়; বরং একজন সাধারণ ও নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষও চোখে দেখে যেন এটা জেনে নিতে পারে। এ জন্যই নামায ও রোযার সময় ও ওয়াক্ত সূর্যের হিসাব দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন, ফজরের ওয়াক্ত সুব্হে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যোহরের ওয়াক্ত সূর্য মধ্য গগণ থেকে ঢলে পড়ার পর থেকে এক মিছাল অথবা দুই মিছাল (সদৃশ) ছায়া পর্যন্ত এবং আসরের ওয়াক্ত এরপর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পর থেকে 'শফক' বাকী থাকা পর্যন্ত এবং এশার ওয়াক্ত শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বলা হয়েছে। তদ্রূপভাবে রোযার সময় সুব্হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

একথা স্পষ্ট যে, এ সময়গুলো জানার জন্য কোন বিদ্যা, কোন দর্শন অথবা কোন যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না; বরং প্রতিটি মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা এগুলো জেনে নিতে পারে। আর যেভাবে সাধারণ মানুষের সুবিধার লক্ষ্যে নামায ও রোযার এ ওয়াক্তসমূহের জন্য সূর্যের উদয়-অস্ত ও উঠানামাকে মাপকাঠি ও চিহ্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনিভাবে যাকাত, রোযা এবং হজ্জের মত আমল ও এবাদতের জন্য– যেগুলোর সম্পর্ক মাস অথবা বছরের সাথে– চাঁদকে মাপকাঠি ধরা হয়েছে এবং সৌরবর্ষ ও সৌরমাসের স্থলে চান্দ্রবর্ষ ও চান্দ্রমাসকে স্থির করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ মানুষ নিজেদের চোখে দেখে চান্দ্রমাসকেই ধরতে পারে, সৌরমাসের আগমনের উপর এমন কোন আলামত ও লক্ষণ আসমানে অথবা যমীনে প্রকাশ পায় না, যা দেখে প্রত্যেক মানুষই বুঝে নিতে পারে যে, এখন আগের মাস শেষ হয়ে আরেকটি মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, চান্দ্র মাস যেহেতু চাঁদের উদয় দ্বারা শুরু হয়, এ জন্য একজন নিরক্ষর মানুষও আকাশে নতুন চাঁদ দেখে বুঝে নেয় যে, গত মাস শেষ হয়ে এখন নতুন মাস শুরু হয়ে গিয়েছে।

যাহোক, ইসলামী শরীঅত মাস ও বছরের বেলায় চাঁদের হিসাবের যে নিয়ম প্রবর্তন করেছে, এর একটি বিশেষ রহস্য ও হেকমত সাধারণ মানুষের এ সহজবোধ্যতাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাহে রমযানের রোযার ফরযিয়্যতের বিধান শুনালেন, তখন এটাও বলে দিলেন যে, রমযানের শুরু অথবা সমাপ্তির নিয়ম ও মাপকাঠি কি। তিনি বলে দিলেন যে, শা'বানের ২৯ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে রমযানের রোযা শুরু করে দাও। আর যদি ২৯ তারিখ চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা শুরু কর এবং এভাবে রোযা ২৯ অথবা ৩০টি রাখ। তারপর তিনি বিভিন্ন সময় চাঁদ দেখা সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ ভূমিকার পর এবার নিম্নের হাদীসগুলো পাঠ করে নিন ঃ

(٨٣) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَتَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْلَهُ * (رواه البخارى ومسلم)

৮৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রমযান প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখে রোযা ছাড়বে না। যদি (২৯ তারিখে) চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে এর হিসাব পূর্ণ করে নাও (অর্থাৎ, ৩০ দিনের মাস মনে করে নাও।) —বুখারী, মুসলিম

(٨٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ * (رواه البخارى ومسلم)

৮৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। আর যদি (২৯ তারিখে) চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শা'বানের ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করে নাও। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, রমযানের শুরু ও সমাপ্তির বিষয়টি চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। কেবল কোন হিসাব, ইঙ্গিত অথবা অনুমানের ভিত্তিতে এর হুকুম দেওয়া যাবে না। তারপর চাঁদ দেখার প্রমাণের একটি পদ্ধতি তো এই যে, আমরা নিজেরা নিজ চোখে চাঁদ দেখে নিলাম। আর একটি পদ্ধতি এই যে, অন্য কেউ চাঁদ দেখে আমাদেরকে বলল, আর ঐ ব্যক্তিটি আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, তিনি অন্য কোন দর্শনকারীর সংবাদ এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন এবং রোযা রাখার অথবা ঈদ করার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। যেমন, সামনের কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

(٨٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ * (رواه الترمذى)

৮৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের (হিসাব ঠিক রাখার) জন্য তোমরা শা'বানের চাঁদকে ভালভাবে গণনা কর। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, রমযানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য শা'বানের চাঁদ দেখার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকা চাই এবং এর দিন-তারিখ মনে রাখার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা করা চাই। এভাবে যখন ২৯ দিন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন রমযানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে হবে।

(٨٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهٖ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ * (رواه ابوداؤد)

৮৬। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বানের দিন-তারিখ যেভাবে মনে রাখতেন, অন্য কোন মাসের দিন-তারিখ এভাবে মনে রাখতেন না। তারপর রমযানের চাঁদ দেখে তিনি রোযা রাখতেন। যদি (২৯শে শা'বান) চাঁদ দেখা না যেত, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা রাখতেন। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের গুরুত্বের কারণে শা'বানের চাঁদ দেখা ও এর তারিখ মনে রাখার প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতেন। তারপর যদি ২৯শে শা'বান রমযানের চাঁদ দেখা দিত, তাহলে রমযানের রোযা রাখা শুরু করে দিতেন, আর চাঁদ দেখা না গেলে শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা রাখতেন।

সংবাদ ও সাক্ষ্যের দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হওয়া প্রসঙ্গ

(٨٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِىْ هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ

نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا * (رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى)

৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমি আজ রমযানের চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি একথার সাক্ষ্যদান কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল ? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। (অর্থাৎ, আমি তওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাসী মুসলমান।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ হে বিলাল! তুমি লোকদের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল থেকে রোযা রাখে। —আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, চাঁদ দেখার সাক্ষ্য ও সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, সংবাদদাতা অথবা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে মুসলমান হতে হবে। কেননা, সে-ই এর নাজুকতা ও গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

(٨٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَ النَّاسُ الْهِلَالَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِّي رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ * (رواه ابوداؤد والدارمى)

৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার লোকেরা চাঁদ দেখার চেষ্টা করল, (কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা দেখতে পেল না।) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তিনি তখন নিজেও রোযা রাখলেন এবং অন্য লোকদেরকেও রোযা রাখার হুকুম দিলেন। —আবূ দাউদ, মুসনাদে দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীস দ্বারা একথাও জানা গেল যে, রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কেবল একজন মুসলমানের সাক্ষ্য এবং সংবাদও যথেষ্ট হতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী একজন মানুষের সাক্ষ্য ঐ অবস্থায় যথেষ্ট হয়, যখন আকাশ পরিষ্কার না থাকে; বরং মেঘ অথবা ধূলিকণায় আচ্ছন্ন থাকে অথবা সে বাইরের কোন উঁচু অঞ্চল থেকে এসে থাকে। কিন্তু আকাশ যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে এবং যে চাঁদ দেখেছে, সে যদি বাইরের কোন উঁচু স্থান থেকেও না এসে থাকে; বরং এ জনপদেই চাঁদ দেখার দাবী করে– যেখানে চেষ্টা সত্ত্বেও অন্য কেউ চাঁদ দেখে নাই, এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না; বরং এ অবস্থায় চাঁদ দর্শনকারী লোকের সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়া চাই, যাদের সাক্ষ্যের উপর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই। তবে ইমাম সাহেব (রহঃ)-এর একটি বক্তব্য এও রয়েছে যে, রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন দ্বীনদার ও নির্ভরযোগ্য মুসলমানের সাক্ষ্য যে কোন অবস্থায়ই যথেষ্ট। আর অধিকাংশ অন্য ইমামদের মতও এটাই।

এখানে যাকিছু আলোচনা করা হয়েছে, এর সম্পর্ক রমযানের চাঁদ দেখার সাথে। কিন্তু ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের নিকট কমপক্ষে দু'জন দ্বীনদার ও নির্ভরযোগ্য মুসলমানের সাক্ষ্য অপরিহার্য। ইমাম দারাকুতনী ও তাবারানী নিজ নিজ সনদে তাবেয়ী ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মদীনার শাসকের সামনে এক ব্যক্তি এসে রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস উভয়ই মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন। মদীনার শাসক তখন তাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়েই বললেন যে, এ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হোক এবং রমযানের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হোক। এর সাথে তারা একথাও বললেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَانَ لاَ يُجِيْزُ شَهَادَةَ الْاِفْطَارِ اِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ *

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যকে অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে দু'ব্যক্তির কম সাক্ষী হলে তিনি তা অনুমোদন করতেন না।

রমযান শুরুর এক দু'দিন আগ থেকে রোযা রাখার নিষিদ্ধতা

ইসলামী শরীঅতে পূর্ণ রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে এবং যেমন এইমাত্র জানা গেল যে, শরীঅত এ নির্দেশও দিয়েছে যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে– এমনকি এ উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদ দেখার ব্যাপারেও খুব সতর্ক থাকতে হবে– যাতে কোন প্রকার ভ্রমে পড়ে অথবা উদাসীনতার কারণে রমযানের কোন রোযা ছুটে না যায়। কিন্তু শরীঅতের সীমা রেখার হেফাযতের জন্য এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, রমযানের এক দু'দিন পূর্ব থেকেই যেন রোযা রাখা শুরু করে দেওয়া না হয়। আল্লাহ্র এবাদতে কোন অতি উৎসাহী মানুষ যদি এমনটি করতে যায়, তাহলে এ আশংকা থেকে যায় যে, অজ্ঞ সাধারণ মানুষ এটাকেই শরীঅতের হুকুম ও মাসআলা মনে করে নেবে। এ জন্য এ প্রবণতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

(٨٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الْيَوْمَ * (رواه البخارى ومسلم)

৮৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রমযানের এক দু'দিন পূর্ব থেকেই রোযা রাখা শুরু না করে। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ দিন রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এদিন রোযা রেখে নেবে। (যেমন, একজনের অভ্যাস এই যে, সে প্রতি বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার রোযা রাখে। এখন যদি ২৯ অথবা ৩০ শা'বান বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার পড়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য এ দিন রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

(٩٠) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى)

৯০। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল, সে আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের অবাধ্যতা করল। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ সন্দেহের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ দিন, যার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, এটা হয়তো রমযানের দিন হবে। যেমন, ২৯শে শা'বান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকল এবং চাঁদ দেখা গেল না। এমতাবস্থায় পরবর্তী দিনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, আজ হয়তো চাঁদ উঠেছে এবং আকাশে মেঘ অথবা ধূলি থাকার কারণে তা দেখা যায়নি। তাই এ হিসাবে আগামীকাল রমযান হবে। শরীঅতে এ সন্দেহ ও ধারণার কোন ভিত্তি নেই এবং এর উপর ভিত্তি করে ঐ দিন রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আর উপরের কোন কোন হাদীস থেকে ইতিপূর্বেই এ বিষয়টি জানা গিয়েছে যে, এমতাবস্থায় শা'বানের ৩০দিন পূর্ণ করে পরে রোযা রাখতে হবে।

সাহ্‌রী ও ইফতার সম্পর্কে কতিপয় দিকনির্দেশনা

(٩١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً * (رواه البخارى ومسلم)

৯১। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা, সাহ্‌রী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সাহ্‌রীতে বরকত থাকার একটি বাহ্যিক ও সাধারণ দিক তো এই যে, এর দ্বারা রোযাদারের শক্তি অর্জিত হয় এবং রোযা রাখা বেশী দুর্বলতার কারণ ও কঠিন হয় না। দ্বিতীয় ঈমানী ও ধর্মীয় দিকটি এই যে, যদি সাহ্‌রী খাওয়ার রেওয়াজ না থাকে অথবা উম্মতের বড় বড় মনীষী ও বিশেষ ব্যক্তিরা সাহ্‌রী না খায়, তাহলে এ আশংকা থাকে যে, সাধারণ মানুষ এটাকেই শরীঅতের বিধান অথবা কমপক্ষে উত্তম কাজ মনে করে নেবে এবং এভাবে শরীঅতের নির্ধারিত সীমারেখায় পরিবর্তন এসে যাবে। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এভাবেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে। তাই সাহ্‌রীর একটি বরকত এবং এর একটি বিরাট দ্বীনি ফায়েদা এও যে, এর দ্বারা দ্বীনবিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং এজন্যই এটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত লাভের উপায়।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلسَّحُوْرُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوْهُ وَلَوْ اَنْ يَّجْرَعَ اَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ *

অর্থাৎ, সাহ্রীতে বরকত রয়েছে। তাই তোমরা এটা ছাড়বে না। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ তোমরা এক ঢোক পানিই পান করে নেবে। কেননা, সাহ্রী গ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ্ রহমত করেন এবং ফেরেশ্তারাও তাদের জন্য দো'আ করে।

(৯২) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ * (رواه مسلم)

৯২। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহ্লে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী জিনিসটি হল সাহ্রী খাওয়া। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, আহ্লে কিতাবের নিকট রোযার জন্য সাহ্রী নেই, আর আমাদের নিকট সাহ্রী খাওয়ার হুকুম রয়েছে। এ জন্য এ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে বাস্তব আমলের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহের যে, তিনি আমাদের জন্য সহজ বিধান দিয়েছেন, এর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

ইফতারে তাড়াতাড়ি ও সাহ্রীতে দেরী করার হুকুম

(৯৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا * (رواه الترمذى)

৯৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট তারাই সর্বাধিক প্রিয়, যারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করে। (অর্থাৎ, সূর্যাস্তের পর মোটেই দেরী করে না।) —তিরমিযী

(৯৪) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ * (رواه البخارى ومسلم)

৯৪। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের লোকেরা সে পর্যন্ত কল্যাণ পথে থাকবে, যে পর্যন্ত তারা ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'শীঘ্র ইফতার করবে' কথাটির পর 'দেরী করে সাহ্রী খাবে' বাক্যটিও এসেছে। অর্থাৎ, এ উম্মতের অবস্থা ততদিন পর্যন্ত ভাল থাকবে, যতদিন পর্যন্ত ইফতারে তাড়াতাড়ি করা এবং সাহ্রীতে দেরী করা তাদের কর্মনীতি থাকবে। এর রহস্য এই যে, শীঘ্র ইফতার করা এবং দেরী করে সাহ্রী খাওয়া এটা হচ্ছে শরীঅতের হুকুম এবং আল্লাহ্র মর্জির অনুসরণ। আর এতে আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য আসানীও রয়েছে, যা আল্লাহ্র রহমত ও কৃপাদৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। এ জন্য উম্মত যে পর্যন্ত এর উপর আমল করতে থাকবে, সে পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র কৃপাদৃষ্টি লাভের যোগ্য থাকবে এবং তাদের অবস্থা ভাল থাকবে। এর বিপরীতে ইফতারে দেরী করা ও সাহ্রীতে তাড়াতাড়ি করার মধ্যে যেহেতু আল্লাহ্র সকল

বান্দাদের জন্য কষ্ট রয়েছে এবং এটা এক ধরনের বেদআত ও ইয়াহুদী-নাসারাদের রীতি, এ জন্য এটা এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টির স্থলে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এ কারণে যখন উম্মত এ নীতি অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ইফতারে তাড়াতাড়ি করার অর্থ এই যে, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন আর দেরী করবে না। অনুরূপভাবে সাহ্‌রীতে দেরী করার অর্থ এই যে, সুবহে সাদেকের অনেক আগে অধিক রাত থাকতে সাহ্‌রী খেয়ে নিবে না; বরং সুবহে সাদেক যখন ঘনিয়ে আসে, তখন পানাহার করবে। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ও রীতি ছিল।

(٩٥) عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالسُّحُوْرِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً * (رواه البخارى ومسلم)

৯৫। হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহ্‌রী খেলাম। তারপর তিনি ফজরের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহ্‌রী খাওয়া এবং ফজরের আযানের মধ্যে সময়ের কতটুকু ব্যবধান ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সমপরিমাণ সময়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সঠিক উচ্চারণ ও কেরাআতের নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করতে পাঁচ মিনিটের চেয়েও কম সময় ব্যয় হয়। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহ্‌রী খাওয়া ও ফজরের আযানের মধ্যে কেবল ৪/৫ মিনিটের ব্যবধান ছিল।

সাওমে বেছালের নিষিদ্ধতা

'সাওমে বেছাল' হচ্ছে ইফতার ও সাহ্‌রী ছাড়া একাধারে রোযা রেখে যাওয়া এবং দিনের মত রাতও পানাহার ছাড়া কাটিয়ে দেওয়া। যেহেতু এ ধরনের রোযা মারাত্মক কষ্ট ও দুর্বলতার কারণ হয় এবং এর প্রবল আশংকা থাকে যে, মানুষ এভাবে এমন দুর্বল হয়ে যাবে যে, সে অন্যান্য ফরয এবাদত ও দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের দরুন তিনি অন্যদের তুলনায় বেশী আমল করতেন তাছাড়া, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের অপার্থিব সামর্থ্যও প্রদান করা হত, এ জন্য তিনি নিজে এ ধরনের রোযা রাখতেন।

(٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ * (رواه البخارى ومسلم)

৯৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে 'সাওমে বেছাল' থেকে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিজে তো সাওমে বেছাল করেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে ? (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আচরণ রয়েছে, যা অন্য কারো সাথে নেই। আর সেটা হচ্ছে এই যে,) আমার রাত এভাবে কাটে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। (অর্থাৎ, আমি অদৃশ্য জগৎ থেকে খাদ্য পেয়ে থাকি। তাই এ ব্যাপারে নিজেকে আমার সাথে তুলনা করতে যেয়ো না।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়বস্তুর আরো কিছু হাদীস শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। এসব বর্ণনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আল্লাহ্র বান্দারা যেন কষ্টে পড়ে না যায় এবং তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়; বরং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় তো এ বিষয়টি আরো বেশী স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে। এর শব্দমালা এরূপ ঃ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে তাদেরকে সাওমে বেছাল থেকে নিষেধ করেছেন। —বুখারী, মুসলিম

আর সামনে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেছালে উৎসাহী লোকদেরকে সাহ্রী পর্যন্ত বেছাল করার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

(৯৭) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ لِيْ مُطْعِمٌ يُّطْعِمُنِيْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِيْ * (رواه البخارى)

৯৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সাওমে বেছাল পালন করবে না। আর কেউ যদি (মনের উৎসাহে ও আবেগে) বেছাল করতেই চায়, তাহলে সাহ্রী পর্যন্ত করতে পারে। (অর্থাৎ, সাহ্রী থেকে সাহ্রী পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা।) কোন কোন সাহাবী বললেন, আপনি নিজে তো সাওমে বেছাল করেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার একজন খাবার দানকারী থাকে, যে আমাকে আহার যোগায় আর একজন পানীয় দানকারী থাকে, যে আমার পানীয় যোগায়। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসগুলোতে সাওমে বেছালের রাতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পানাহার করানোর যে কথা বলা হয়েছে, এর কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশেষ পদ্ধতি হাদীস দ্বারা জানা যায় না। কেউ কেউ এ থেকে এ বুঝেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেছালে– বিশেষ করে রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার যে বিশেষ নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করতেন, এর দ্বারা তাঁর আত্মা ও অন্তরে এমন শক্তি ও বল এসে যেত, যা তাঁর পানাহারের

স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেত। এটাকে আত্মিক খাবারও বলা যায়। আর কেউ কেউ এর মর্ম এ বুঝেছেন যে, সাওমে বেছালের রাতগুলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাত ও অদৃশ্য জগতের খাদ্য ও পানীয় খাওয়ানো ও পান করানো হত। তবে এ খাওয়া ও পান করা এ জগতে হত না; বরং তখন তিনি অন্য কোন জগতে থাকতেন।

ইফতারের জন্য কোন্ জিনিস উত্তম ?

(٩٨) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ * (رواه احمد ابوداؤد والترمذى وابن ماجة والدارمى)

৯৮। হযরত সালমান ইবনে আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। আর যদি খেজুর না পায়, তাহলে যেন পানি দিয়েই ইফতার করে নেয়। কেননা, পানি হচ্ছে পবিত্রকারী। —আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ আরবের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ করে মদীনাবাসীর জন্য খেজুর উত্তম খাদ্য ছিল এবং এমন সহজলভ্য ও সস্তাও ছিল যে, গরীব ও অভাবী লোকেরাও এটা খেত। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জিনিস দিয়ে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে খেজুর না পায়, তাকে পানি দ্বারা ইফতার করতে বলেছেন এবং এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে পবিত্রকারী জিনিস বানিয়েছেন। এর দ্বারা ইফতার করাতে বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগ তথা দেহ ও মনের পবিত্রতার প্রতি শুভ ইঙ্গিতও রয়েছে।

(٩٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَّاءٍ * (رواه الترمذى ابوداؤد)

৯৯। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি উপস্থিত সময়ে তাজা খেজুর পাওয়া না যেত, তাহলে শুকনা খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন, আর শুকনা খেজুরও পাওয়া না গেলে কয়েক চুমুক পানি পান করে নিতেন। —তিরমিযী, আবূ দাউদ

ইফতারের দো'আ

(١٠٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهٗ بَلَغَهٗ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ * (رواه ابوداؤد)

১০০। মো'আয ইবনে যুহরা তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে একথা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ (অর্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি।) —আবূ দাউদ

(١٠١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ * (رواه ابوداؤد)

১০১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন বলতেন ঃ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ (অর্থ ঃ পিপাসা দূর হয়ে গেল, শিরা-উপশিরা যা শুকিয়ে গিয়েছিল তা সিক্ত হল, আর আল্লাহ্ চাইলে সওয়াব ও প্রতিদানও নির্ধারিত হয়ে গেল।) —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, পিপাসা ও শুষ্কতার যে কষ্ট আমরা কিছু সময় বরদাশ্ত করলাম, ইফতার করা মাত্রই সেটা দূর হয়ে গেল। এখন না পিপাসা আছে, না শিরাগুলোতে শুষ্কতা আছে, আর আখেরাতের অনন্ত প্রতিদান ইন্শাআল্লাহ্ নির্ধারিত হয়েই গিয়েছে। এটা আল্লাহ্র দরবারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুকরিয়াও এবং অন্যদের জন্য শিক্ষাও যে, রোযাদারের বিশ্বাস ও অনুভূতি এমনই হওয়া চাই। উপরের দু'টি দো'আর শব্দমালায় বুঝা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের পর এ বাক্যগুলো বলতেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় এ দো'আও করতেন ঃ يَاوَاسِعَ الْفَضْلِ اِغْفِرْلِيْ

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত

(١٠٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان رواه محى السنة فى شرح السنة)

১০২। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় অথবা কোন মুজাহিদকে জেহাদের উপকরণ সরবরাহ করে, তার জন্য রোযাদার ও মুজাহিদের সমান সওয়াব রয়েছে। —বায়হাকী, শরহুস্ সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহমূলক নীতিগুলোর মধ্যে এটাও একটি নীতি যে, তিনি কোন নেক আমলের প্রতি উৎসাহ দানকারী অথবা এতে সাহায্যকারীকেও স্বয়ং আমলকারীর সমান সওয়াব দিয়ে থাকেন। বাস্তবতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যেসব লোক আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহের সাথে পরিচিত নয়, তাদের মনেই কেবল এসব সুসংবাদের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

সফরের অবস্থায় রোযা

কুরআন মজীদে সূরা বাকারায় যেখানে রমযানের রোযার ফরযিয়্যতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানে অসুস্থ ও মুসাফিরদেরকে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা অসুস্থতা ও সফরের পর নিজেদের রোযা পূর্ণ করে

নেবে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ অনুমতি ও অবকাশ বান্দাদের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যান্য দিনগুলোতে রমযানের এ গণনা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা ও কাঠিন্য কামনা করেন না। (সূরা বাক্বারা ঃ রুকূ ২৩)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, এ অবকাশ বান্দাদের সুবিধা ও আসানীর জন্য এবং তাদেরকে জটিলতা ও কাঠিন্য থেকে বাঁচানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই যদি কোন ব্যক্তি সফরে থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে বিশেষ কোন কষ্ট ও অসুবিধা অনুভব না করে, তাহলে সে রোযা রাখতে পারে আর ইচ্ছা করলে অবকাশও গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মনীতি যেহেতু উম্মতের জন্য উসওয়া ও আদর্শ, এ জন্য তিনি সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো কাযাও করেছেন। যাতে উম্মত নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী যে কোন পদ্ধতির উপর আমল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মনীতি দ্বারা যা বুঝা যায় সেটা এই যে, সফরে রোযা রাখাতে যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহলে রোযা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী সময়ে কাযা করে নেওয়াই উত্তম। আর যদি এমন না হয়, তাহলে রোযা রেখে নেওয়াই উত্তম।

(١٠٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী– যিনি খুব বেশী রোযা রাখতেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখব ? তিনি উত্তর দিলেন, ইচ্ছা করলে রাখতে পার, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার। —বুখারী, মুসলিম

(١٠٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَالِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন এবং উসফান নামক

স্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখলেন। (সেখান থেকে তিনি রোযা ছেড়ে দিলেন এবং সবাইকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য) তিনি পানি চাইলেন। তারপর এ পানি হাতে নিয়ে উপরের দিকে তুলে ধরলেন– যাতে সবাই দেখতে পারে। (তারপর এ পানি পান করে নিলেন।) এবং মক্কা না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা রাখলেন না। আর এটা হয়েছিল রমযান মাসে। এ জন্য ইবনে আব্বাস বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রোযা রেখেছেনও, আবার কাযাও করেছেন। তাই যার ইচ্ছা রোযা রেখে নিক আর যার ইচ্ছা পরে কাযা করে নিক। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মক্কার যে সফরের উল্লেখ রয়েছে এটা মক্কা বিজয়ের সময়কার সফর ছিল– যা অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হয়েছিল। এতে তিনি প্রথমে রোযা রাখতে থাকলেন, কিন্তু যখন উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, (যা মক্কা মুকাররমা থেকে ৩৫/৩৬ মাইল সম্মুখে একটি ঝর্ণা ছিল।) এবং সেখান থেকে মক্কা কেবল দুই মন্‌যিলের দূরত্ব রয়েগেল, আর এ আশংকা দেখা দিল যে, নিকটবর্তী সময়েই কোন প্রতিরোধ অথবা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাই তিনি তখন রোযা রাখা উপযোগী মনে করলেন না এবং নিজেই রোযা ছেড়ে দিলেন এবং অন্যদেরকে দেখিয়ে পানি পান করে নিলেন– যাতে কারো জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া কঠিন মনে না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাস্তব কর্ম দ্বারা জানা গেল যে, যে পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দেওয়ার তেমন কোন কারণ ও যুক্তিসিদ্ধতা না থাকে, সে পর্যন্ত রোযা রেখে যাওয়াই উত্তম। এ জন্যই তিনি 'উসফান' পর্যন্ত রোযা রেখে গিয়েছেন। কোন বিশেষ কারণ ও যুক্তিসিদ্ধতা ছাড়াও যদি সফরে রোযা ছেড়ে দেওয়া উত্তম হত, তাহলে তিনি সফরের শুরু থেকেই রোযা ছেড়ে দিতেন।

এ ঘটনা সম্পর্কেই হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকেও একটি বর্ণনা মুসলিম শরীফে এসেছে। সেখানে এ অতিরিক্ত সংযোজনও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এভাবে ঘোষণা দিয়ে রোযা ছেড়ে দেওয়ার পর এবং সবাইকে দেখিয়ে পানি পান করার পরও কিছু লোক রোযা অব্যাহত রাখল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন ঃ 'এরা হচ্ছে অবাধ্য ও গুনাহগার'। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশ পাওয়ার পরও এর বিপরীত কাজ করেছে– যদিও না জেনে অথবা ভুল বুঝাবুঝির কারণে করেছে। কেননা, নৈকট্যশীলদের সামান্য ভুলও অপরাধ।

(١٠٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ * (رواه مسلم)

১০৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ১৬ই রমযান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযাদার ছিল, আর কেউ কেউ রোযা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু রোযাদাররা বে-

contents

রোযাদারদের উপর এবং বে-রোযাদাররা রোযাদারদের উপর কোনরূপ আপত্তি করে নাই। (অর্থাৎ, প্রত্যেকেই অন্যের কর্মনীতিকে শরীঅতসম্মত মনে করেছে।) —মুসলিম

(١٠٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْاَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৬। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযাদার ছিল, আর কেউ কেউ বে-রোযাদার। এ অবস্থায় এক প্রচন্ড গরমের দিনে আমরা এক মন্যিলে অবতরণ করলাম। এ সময় রোযাদাররা (রোযায় কাতর হয়ে) পড়ে গেল আর বে-রোযাদাররা উঠে সবার জন্য তাবু তৈরী করল এবং বাহনের পশুদেরকে পানি পান করাল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজ তো বে-রোযাদাররাই বেশী সওয়াব নিয়ে গেল। —বুখারী, মুসলিম

(١٠٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَرَأٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৭। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। এর মধ্যে তিনি মানুষের ভীড় দেখলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার উপর ছায়া করে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি ব্যাপার ? লোকেরা উত্তরে বলল, এ লোকটি রোযাদার, (গরমে কাতর হয়ে গিয়েছে। তাই ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ জন্যই এ ভীড় দেখা যাচ্ছে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ সফরের অবস্থায় এভাবে রোযা রাখার তো কোন মানে হয় না। এতে কী সওয়াব! —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য এ ছিল যে, যেহেতু সফরের অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা রোযা না রাখার অনুমতি ও অবকাশ দিয়েছেন, আর আমি নিজেও এর উপর আমল করি। তাই মুসলমানদের কারো জন্য এ অবস্থায় রোযা রাখা যে, নিজেও পড়ে যায় আর অন্যরাও তার খেদমতে ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়ে যায়, এটা তো কোন পুণ্যের কাজ নয়। এমন অবস্থায় তো আল্লাহ্‌র দেওয়া অবকাশের উপর আমল করে রোযা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আর এতেই থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

ফরয রোযার কাযা

(١٠٨) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَابَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَاتَقْضِى الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يُصِيْبُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ * (رواه مسلم)

১০৮। মো'আযাহ (তাবেয়ী মহিলা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এটা কি ব্যাপার যে, হায়েযা মহিলারা রোযার তো কাযা করে; কিন্তু নামাযের কাযা করে না ? আয়েশা (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের যখন এমন হত, তখন আমাদেরকে রোযার কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত; কিন্তু নামাযের কাযার নির্দেশ দেওয়া হত না। —মুসলিম

বিনা ওযরে ফরয রোযা ভাঙ্গার কাফ্ফারা

(١٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اِجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمَرٌ (وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ) قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ) اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি হয়েছে ? লোকটি বলল, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন গোলাম আযাদ করতে পারবে ? সে বলল , না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে ? সে বলল, না। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাবার দিতে পারবে ? সে বলল, এ সামর্থ্যও আমার নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বসে থাক। (হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কোন উপায় বের করে দিবেন।) আবূ হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে বসে রইলেন। আমরাও এ অবস্থায় বসা ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের এক বিরাট থলে আসল। তিনি তখন ডাক দিয়ে বললেন ঃ মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী লোকটি কোথায় ? সে বলল, এই যে, আমি হাজির। তিনি বললেন ঃ এ থলেটি নিয়ে নাও এবং (নিজের পক্ষ থেকে) সদাকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে বেশী অভাবী কোন মানুষের উপর সদাকা করব ? আল্লাহ্র কসম! মদীনার দু' প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমির মাঝে (অর্থাৎ, মদীনায় সম্পূর্ণ জনপদে) আমার পরিবারের চেয়ে বেশী অভাবী কোন পরিবার নেই। (তার এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের অভ্যাসের বিপরীত) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর দান্দান মোবারক বেশ

contents

খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। (অথচ অভ্যাস হিসাবে তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।) তারপর বললেন ঃ এগুলো নিজের পরিবারের লোকদেরকেই খাইয়ে দাও। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি রমযানের রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়নায় এমন ভুল করে বসে, তাহলে এর কাফ্ফারা এই যে, যদি একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে গোলাম আযাদ করে দেবে। আর যদি এর সামর্থ্য না থাকে, তাহলে একাধারে দু' মাস রোযা রাখবে, যদি এরও শক্তি না থাকে, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ্দের মাযহাব এটাই। তবে এ ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে যে, এ কাফ্ফারা কি কেবল ঐ অবস্থায় ওয়াজিব হবে যখন কেউ রোযা রেখে স্ত্রীসঙ্গম করে ফেলে, না ঐ অবস্থাতেও ওয়াজিব হবে, যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট এ কাফ্ফারা কেবল স্ত্রীসঙ্গমের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কেননা, হাদীসে যে ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, সেটা স্ত্রীসঙ্গমেরই ঘটনা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রমুখ ইমামদের মাযহাব এই যে, এ কাফ্ফারা আসলে রমযানের রোযার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের কারণে এবং এ অপরাধের শাস্তি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, সে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে রমযানের রোযার মর্যাদা রক্ষা করে নাই; বরং রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। আর এ অপরাধটি উভয় অবস্থায়ই সমান। তাই কেউ যদি জেনে-শুনে পানাহার করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

এ হাদীসে একটি আশ্চর্য বিষয় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার সাথে জড়িত ঐ সাহাবীকে গরীব-মিসকীনকে দান করার জন্য খেজুরের যে বিরাট থলেটি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সে যখন বলল যে, সারা মদীনায় আমার পরিবারের চেয়ে বেশী অভাবী কোন পরিবার নেই, তখন তিনি এগুলো তার নিজের প্রয়োজনেই ব্যবহার করে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামদের মত এই যে, এর অর্থ এই নয় যে, এভাবে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে গেল; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপস্থিত প্রয়োজন ও অভাবের দিকে লক্ষ্য করে খেজুরগুলো নিজের খরচে নিয়ে আসতে সেই সময়কারমত অনুমতি দিয়ে দিলেন; কিন্তু কাফ্ফারা তার দায়িত্বে ওয়াজিব রয়ে গেল। আর মাসআলা এটাই যে, যদি রমযানের রোযা এমন কোন ব্যক্তি এভাবে ভেঙ্গে ফেলে, যে উপস্থিত সময়ে গোলাম আযাদ করতে পারে না, একাধারে দু'মাস রোযাও রাখতে পারে না এবং অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে ষাটজন মিসকীনকে আহারও করাতে পারে না; তাহলে কাফ্ফারা তার দায়িত্বে ওয়াজিব থাকবে। সে এটা আদায় করার নিয়্যত রাখবে এবং যখনই সামর্থ্য হবে, তখন ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। ইমাম যুহরী প্রমুখ কতিপয় ইমামের মত এই যে, শরীঅতের সাধারণ বিধান ও মাসআলা তো এটাই; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সাহাবীর সাথে এক ধরনের ব্যতিক্রমী আচরণ করেছেন এবং তার কাফ্ফারা এভাবেই আদায় হয়ে গিয়েছে।

এ ঘটনাটি বুখারী ও মুসলিমে কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন, কোন কোন আলেম মনীষী (যাদেরকে আমাদের উস্তাদগণ দেখেছেন) দু' খণ্ড বিশিষ্ট পুস্তক লিখে আবূ হুরায়রা

(রাযিঃ)-এর এ হাদীসের দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এ হাদীস দ্বারা এক হাজার মাসআলা ও সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায়।

যেসব কারণে রোযা নষ্ট হয় না

কোন কোন জিনিস এমন আছে যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে যে, এর দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায় অথবা রোযার কোন ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাণী অথবা আমল দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এগুলোর দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হয় না। এ ধারার কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(١١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ * (رواه البخارى ومسلم)

১১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি ভুলে (অর্থাৎ, রোযার কথা ভুলে গিয়ে) পানাহার করে ফেলল, (তার রোযা ভঙ্গ হয় নাই।) তাই সে যেন নিজের রোযা পুরা করে নেয়। কেননা, আল্লাহ্ই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (সে ইচ্ছা করে রোযা ভাঙ্গে নাই। তাই তার রোযা ঠিকই আছে।) —বুখারী, মুসলিম

(١١١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ لَايُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحَجَامَةُ وَالْقَيْئُ وَالْاِحْتِلَامُ * (رواه الترمذى)

১১১। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (১) শিংগা লাগানো, (২) বমি হওয়া, (৩) স্বপ্নদোষ হওয়া। —তিরমিযী

(١١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَسَاَلَهُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ * (رواه ابوداؤد)

১১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন ইত্যাদি করা যায় কি না ? তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন। তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করল। কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন (এবং অনুমতি দিলেন না।) আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম, যাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, সে লোকটি ছিল বুড়ো বয়সের, আর যাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, সে ছিল একজন যুবক। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণটি স্পষ্ট। যুবক মানুষের বেলায় যেহেতু এ আশংকা থাকে যে, নফ্সের চাহিদা তার উপর প্রবল হয়ে যাবে এবং সে রোযা নষ্ট করে ফেলবে, তাই এ যুবক প্রশ্নকারীকে এর অনুমতি দিলেন না। কিন্তু বুড়ো মানুষ যেহেতু এ আশংকা থেকে তুলনামূলক মুক্ত থাকে, তাই এ বয়স্ক প্রশ্নকারীকে অবকাশ ও অনুমতি দিয়ে দিলেন।

(١١٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِشْتَكَيْتُ عَيْنِىْ اَفَاَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ * (رواه الترمذى)

১১৩। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার চোখে অসুখ, তাই আমি কি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতে পারব ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, চোখে সুরমা অথবা অন্য কোন ঔষধ লাগানোর কারণে রোযার উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না এবং কোন ক্ষতি হয় না।

(١١٤) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاَ اُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ * (رواه الترمذى ابوداؤد)

১১৪। হযরত আমের ইবনে রবীআ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য বার দেখেছি যে, তিনি রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করছেন। —তিরমিযী, আবূ দাউদ

(١١٥) عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطْشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ * (رواه مالك وابوداؤد)

১১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরজ' নামক স্থানে দেখেছি যে, তিনি রোযা অবস্থায় পিপাসা অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালছেন। —মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রোযা অবস্থায় পিপাসা অথবা গরমের প্রচণ্ডতা লাঘব করার জন্য মাথায় পানি ঢালা অথবা এ ধরনের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা জায়েয এবং এটা রোযার চেতনা পরিপন্থী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কোন কোন কাজ এ জন্যও করতেন যে, এ কর্মনীতি দ্বারা নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা ফুটে উঠে– যা হচ্ছে দাসত্বের প্রাণবস্তু। তাছাড়া তিনি উম্মতের জন্য সহজসাধ্যতার নমুনা কায়েম করতে চাইতেন। আল্লাহ্র অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর।

'আরজ' মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে তিন মন্যিলের মাথায় একটি আবাদ জনবসতি ছিল। এ জন্য এ ঘটনাটি কোন সফরের হবে। হতে পারে যে, এটা মক্কা বিজয়ের সফরের ঘটনাই হবে– যা রমযান শরীফে হয়েছিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান নামক স্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত রোযা রেখে যাচ্ছিলেন।

(١١٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لاَبَاسَ قَالَ فَمَهْ * (رواه ابوداؤد)

১১৬। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, একবার আমি রোযা অবস্থায় খাহেশের কাছে কিছুটা পরাভূত হয়ে গেলাম এবং স্ত্রীকে চুমু খেয়ে বসলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি একটি মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি, আমি রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খেয়েছি। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো, তুমি যদি মুখে পানি নিয়ে কুল্লি কর, (তাহলে এতে কি তোমার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ?) আমি উত্তর দিলাম, এতে তো রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি তখন বললেন ঃ তাহলে (শুধু চুমু খাওয়াতে) কি হল ? —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উত্তর দ্বারা কেবল এ একটি মাসআলাই জানা হয়নি যে, শুধু চুমু খাওয়াতে রোযার ক্ষতি হয় না; বরং একটি মূলনীতি জানা হয়ে গেল যে, রোযা ভঙ্গকারী জিনিস হল খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রীসঙ্গম করা। আর যেভাবে পানাহারের কোন জিনিস কেবল মুখে রেখে দিলেই রোযা নষ্ট হয় না, তেমনিভাবে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া ও স্পর্শ করাতে (যা কেবল স্ত্রীসঙ্গমের ভূমিকা হয়ে থাকে) রোযা নষ্ট হয় না। হ্যাঁ, যে ব্যক্তির বেলায় এ আশংকা থাকে যে, সে খাহেশের কাছে পরাভূত হয়ে গিয়ে স্ত্রীসঙ্গমেই লিপ্ত হয়ে যাবে, তার জন্য রোযা অবস্থায় এসব বিষয় থেকেও দূরে থাকতে হবে– যেমন, উপরের কোন কোন হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি আগেও জানা হয়ে গিয়েছে।

নফল রোযা প্রসঙ্গ

নামায এবং যাকাতের মত রোযার একটি কোর্স ও নেছাবকে তো ইসলামের রুকন ও অপরিহার্য শর্ত সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেটা ছাড়া কোন মুসলমানের জীবন ইসলামী জীবন হতে পারে না। আর সেটা হচ্ছে রমযানের পুরা মাসের রোযা। এ ছাড়া ইসলামী শরীঅতে আত্মার পরিচর্যা ও এর পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য অর্জনের জন্য অন্যান্য নফল এবাদতের মত নফল রোযারও বিধান দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ দিন ও তারিখের বিশেষ ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করে এগুলোতে রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক নির্দেশ ছাড়া নিজের আমল ও কর্ম দ্বারাও উম্মতকে এ নফল রোযাগুলোর প্রতি উৎসাহিত করতেন। তবে এরই সাথে তিনি এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যে, লোকেরা যেন নফল রোযার বেলায় সীমা লংঘন করে না যায় এবং এগুলোকে ফরযের পর্যায়ে নিয়ে না যায়; বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে ফরযগুলোকে যেন ফরযের মত আদায় করে এবং নফলগুলোকে নফলের পর্যায়েই রাখে। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(١١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ * (رواه ابن ماجة)

১১৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত রয়েছে, (যার দ্বারা ঐ জিনিস পবিত্র হয়ে যায়।) আর দেহের যাকাত হচ্ছে রোযা। —ইবনে মাজাহ্

শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে নফল রোযা

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهٗ فِيْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ * (رواه البخارى ومسلم)

১১৮। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময় নফল) রোযা এভাবে একাধারে রেখে যেতেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়বেনই না। আর কখনো কখনো এভাবে রোযা ছেড়ে দিতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি রোযা ছাড়াই থাকবেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি নাই যে, তিনি রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রেখেছেন। আমি তাঁকে শা'বান মাসেই সবচেয়ে বেশী নফল রোযা রাখতে দেখেছি। (এ হাদীসেরই কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি শা'বানের প্রায় পুরা মাসই রোযা রাখতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশটির মর্ম তো এই যে, নফল রোযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছিল না; বরং তিনি কখনো একাধারে বিরতিহীনভাবে রোযা রাখতেন, আর কখনো একাধারে রোযা ছাড়া থাকতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে উম্মতের যেন কোন সমস্যা না হয়; বরং প্রশস্ততার পথ খোলা থাকে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার অবস্থা ও সাহস অনুযায়ী তাঁর যে কোন রীতি অবলম্বন করতে পারে। দ্বিতীয় অংশটির অর্থ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যত্ন সহকারে পূর্ণ মাসের রোযা কেবল রমযানেই রাখতেন– যা আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, শা'বান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশী রোযা রাখতেন। এমনকি এ হাদীসেরই এক বর্ণনা মতে– তিনি প্রায় পুরা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন এবং খুব কম দিনই রোযা বাদ দিতেন।

শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখার কয়েকটি কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কারণ এমনও রয়েছে, যেগুলোর প্রতি কোন কোন হাদীসেও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, হযরত উমামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ)-এর এক হাদীসে রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ এ মাসেই বান্দাদের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন যেন আমি রোযা অবস্থায় থাকি।

অন্য দিকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এ জন্য বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন যে, সারা বছরে যারা মারা যাবে তাদের তালিকাটি এ মাসেই মালাকুল মওতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই তিনি চাইতেন যে, তাঁর ওফাতের ব্যাপারে যখন মালাকুল মওতকে নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন যেন তিনি রোযা অবস্থায় থাকেন।

তাছাড়া রমযানের আগমন এবং এর বিশেষ নূর ও বরকতের সাথে অধিক সম্পর্ক সৃষ্টির আবেগ ও উৎসাহও এর কারণ হতে পারে এবং এগুলো রমযানের রোযার ভূমিকা ও পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এ হিসাবে শা'বানের এ রোযাগুলোর সম্পর্ক রমযানের রোযার সাথে তাই হবে, যে সম্পর্ক থাকে ফরযের পূর্বে পঠিত নফল নামাযসমূহের মূল ফরযের সাথে। অনুরূপভাবে রমযানের পর শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযার প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে– যা সামনের হাদীসে আসছে– এগুলোর সম্পর্কও রমযানের রোযার সাথে তাই হবে, যা ফরযের পরে পঠিত সুন্নত ও নফল নামাযসমূহের হয়ে থাকে।

শাওয়ালের ছয় রোযা

(١١٩) عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ * (رواه مسلم)

১১৯। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল, তারপর শাওয়ালে আরো ছয়টি নফল রোযা রাখল, এটা সারা বছরের রোযার মত হয়ে গেল। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রমযান মাস যদি ২৯ দিনেরও হয়, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে ৩০ দিনেরই সওয়াব দিয়ে দেন। আর শাওয়ালের ছয়টি রোযা যোগ করলে রোযার সংখ্যা ৩৬ হয়ে যায়। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহমূলক বিধান (একে দশ) অনুযায়ী ৩৬ এর দশগুণ ৩৬০ হয়ে যায়, আর চাঁদের হিসাবে বছরের দিন সংখ্যা ৩৬০ থেকে কমই হয়ে থাকে।

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি সারা রমযানে রোযা রাখার পর শাওয়ালে ৬টি নফল রোযা রাখে, তাহলে সে এ হিসাবে ৩৬০টি রোযার সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই সওয়াব ও প্রতিদানের দিক দিয়ে এটা এমনই হল যে, যেমন কেউ সারা বছরই রোযা রাখল।

প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযাই যথেষ্ট

(١٢٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاَقْرَءِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ وَاَقْرَءْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذَالِكَ * (رواه البخارى ومسلم)

১২০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন ঃ আমাকে জানানো হয়েছে, তুমি এ অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছ যে, সর্বদা দিনে রোযা রাখ আর সারা রাত নফল নামায পড়। (ঘটনা কি তাই ?) আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এমনটি করো না; বরং

রোযাও রাখ আর বিরতিও দাও। অনুরূপভাবে রাতে নামাযও পড়, ঘুমও যাও। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে। তোমার উপর চোখেরও হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার মেহমানদেরও হক রয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বদা বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে, সে যেন রোযাই রাখে নাই। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা– এটা সারা বছর রোযা রাখার মতই। তাই তুমি প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখ। আর প্রতি মাসে একবার কুরআন শরীফ (তাহাজ্জুদের নামাযে) খতম করে নাও। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার শক্তি রাখি। (তাই আমাকে আরো বেশী কিছু করার অনুমতি দান করুন।) তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাঊদ আলাইহিস সালামের মত রোযা রাখ, অর্থাৎ, এক দিন রোযা রাখা আর এক দিন বিরতি দেওয়া। আর তাহাজ্জুদের সাত রাতে একবার কুরআন খতম কর। এর চেয়ে বেশী করতে যেয়ো না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)-এর এবাদতের প্রতি আগ্রহ খুব বেশী ছিল। তিনি সবসময় দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতভর নফল নামায পড়তেন, আর এতে দৈনিক পুরা কুরআন শরীফ খতম করে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তাকে ঐ পরামর্শ দিলেন, যা এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে এবং তিনি তাকে এবাদতে মিতাচার ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার উপর তোমার দেহ-প্রাণ এবং তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং যেগুলো পালন করা অতীব জরুরী। তিনি প্রথমে তাকে মাসে তিন দিন রোযা রাখার এবং তাহাজ্জুদে পুরা মাসে একবার কুরআন শরীফ খতম করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) যখন বললেন যে, আমি অনায়াসে এর চেয়ে বেশী করতে পারি, তাই আমাকে আরো কিছু বেশী করার অনুমতি দেওয়া হোক, তখন তিনি তাকে দাঊদী রোযা (অর্থাৎ, এক দিন রোযা পালন ও এক দিন রোযা ছেড়ে দেওয়া) এবং সপ্তাহে একবার তাহাজ্জুদে কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু এ হাদীস থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ নিষেধ করার উদ্দেশ্য ও অর্থ এই ছিল না যে, বেশী এবাদত করা একটি দোষের কথা; বরং এ নিষেধাজ্ঞা স্নেহ ও দরদের কারণে ছিল। যেমন, ছোট শিশুদেরকে বেশী বোঝা বহন করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। এ কারণেই আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) যখন নিবেদন করলেন যে, আমি এর চেয়ে বেশী করতে পারি, তখন তিনি তাকে প্রতি মাসে কেবল তিনটি রোযার স্থলে পনের দিন রোযা রাখার এবং মাসে একবার কুরআন খতম করার স্থলে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়ে দিলেন; বরং তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী পরে মাত্র পাঁচ দিনে কুরআন শরীফ খতম করার অনুমতিও দিয়েছিলেন। আর কোন কোন সাহাবীকে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনেও কুরআন শরীফ খতম করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(١٢١) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ ؟ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ غَضَبَهٗ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ

دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلَامَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهٗ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهٗ قَالَ لَاصَامَ وَلَا اَفْطَرَ اَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذَالِكَ اَحَدٌ ؟ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَالِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ طُوِّقْتُ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهٗ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ * (رواه مسلم)

১২১। হযরত আবূ কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে রোযা রাখেন ? (অর্থাৎ, নফল রোযা রাখার ব্যাপারে আপনার রীতি ও অভ্যাস কি ?) তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁর রাগ দেখে বললেন ঃ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا- نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِهٖ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ (অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্কে আমাদের রব হিসাবে পেয়ে, ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে পেয়ে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে খুশী। আমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে এবং তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ্ চাই।) হযরত ওমর (রাযিঃ) কথাটি বারবার বলে যাচ্ছিলেন। ফলে তাঁর রাগ প্রশমিত হয়ে গেল। এবার ওমর (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কেমন, যে সর্বদা বিরতিহীনভাবে রোযা রেখে যায় ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তার রোযা রাখাও হল না, রোযা ছাড়াও হল না। ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন, যে দুই দিন রোযা রাখে, আর এক দিন রোযা ছাড়া থাকে ? তিনি বললেন ঃ কেউ কি এমনটি করার শক্তি রাখে ? (অর্থাৎ, এটা খুবই কঠিন। এমনকি প্রতিদিন রোযা রাখার চেয়েও বেশী কঠিন। তাই এমন করা উচিত নয়।) ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন, যে একদিন রোযা রাখে, আর এক দিন রোযা ছেড়ে দেয় ? তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে দাঊদ আলাইহিস সালামের রোযা। (অর্থাৎ, তিনি এক দিন বিরতি দিয়ে এভাবে রোযা রাখতেন।) ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে, আর দু'দিন রোযা ছাড়া থাকে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমাকে যদি এতটুকু শক্তি দেওয়া হত! তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা, আর এক রমযান থেকে আরেক রমযান– এটা (সওয়াব ও প্রতিদানের দিক দিয়ে) সারা বছর রোযা রাখার মতই। আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর আশুরার রোযার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে, এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট, তবে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তাই এগুলোর ব্যাপারেই কিছু নিবেদন করা হচ্ছে।

হাদীসের একেবারে শুরুতে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে রোযা রাখেন ? (অর্থাৎ, নফল রোযার বেলায় স্বয়ং আপনার রীতি ও পদ্ধতি কি ?) এ প্রশ্ন শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এ অসন্তুষ্টি ও অপছন্দনীয়তার ধরন ঠিক তেমনই ছিল, যেমন কোন স্নেহশীল উস্তাদ ও দীক্ষাগুরু কোন ছাত্র অথবা দীক্ষা গ্রহণকারী কোন মুরীদের ভুল অথবা অশোভনীয় প্রশ্নের কারণে রাগ অথবা বিরক্তিবোধ করে থাকেন। এখানে প্রশ্নকারীকে আসল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, অর্থাৎ, এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, আমার জন্য নফল রোযার বেলায় কি রীতি অবলম্বন করা উচিত ? কিন্তু সে এর স্থলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের বিভিন্ন শাখায়– নবুওয়তের পদমর্যাদা ও উম্মতের কল্যাণকামিতার স্বার্থে– এমন কর্মপদ্ধতিও অবলম্বন করতেন, যার অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য সমীচীন নয়। এ জন্য প্রশ্নকারীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে আসল মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কোন উস্তাদ ও দীক্ষাগুরুর এ ধরনের রাগ ও অসন্তুষ্টিও দীক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এ প্রশ্নটি যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ভাল লাগেনি, এ কথা উপলব্ধি করে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিবেদন করলেন ঃ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا الخ তারপর তিনি নফল রোযা সম্পর্কে সঠিক নিয়মে জিজ্ঞাসা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর দান করলেন। যে ব্যক্তি বিরতি ছাড়া দৈনিকই রোযা রাখে, তার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন ঃ 'সে রোযাও রাখল না, বেরোযাও থাকল না', এর দ্বারা এটা যে অপছন্দনীয়, এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য– অর্থাৎ, এ পদ্ধতি ভুল।

হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অতিরিক্ত কথাটি বললেন, এর মর্ম এই যে, রোযার বেলায় সাধারণ মুসলমানদের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা রমযানের ফরয রোযাগুলো রাখবে, এ ছাড়া প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযা রেখে নিবে– যা একে দশ এর হিসাব অনুযায়ী সওয়াবের ক্ষেত্রে ত্রিশ রোযার সমান হয়ে যাবে এবং এভাবে তারা সারা বছরের রোযার সওয়াব পেয়ে যাবে। আরো অতিরিক্ত লাভ ও বাড়তি সঞ্চয়ের জন্য আরাফার দিবস ও আশুরা দিবসের দু'টি রোযাও রেখে নিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, দয়াময় মালিকের অপার অনুগ্রহ থেকে আমি আশা করি যে, আরাফার দিনের রোযা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের গুনাহর এবং আশুরা দিবসের রোযা বিগত এক বছরের গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, আরাফার দিন যা আসলে হজ্জ দিবস– রোযা রাখার এ ফযীলত এবং এর প্রতি এ উৎসাহদান হজ্জ পালনরত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য। হাজীদের জন্য এ দিনের বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে আরাফায় অবস্থান, যার জন্য যোহর ও আছরের নামায এক সাথে এবং কসর করে পড়ে নেওয়ার নির্দেশ এসেছে এবং যোহরের সুন্নতও সে দিন ছেড়ে

দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ দিন যদি হাজী সাহেবান রোযা রাখেন, তাহলে তাদের জন্য আরাফায় উকূফ করা এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মুযদালেফায় রওয়ানা হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা পছন্দনীয় নয়; বরং এক হাদীসে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে নিজের আমল দ্বারাও এ শিক্ষাই উম্মতকে দান করেছেন। এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন ঠিক ঐ সময়ে যখন তিনি আরাফার ময়দানে উটের উপর সওয়ার ছিলেন এবং উকূফ করছিলেন– সবার সামনে দুধ পান করে নিলেন, যাতে সবাই দেখে নেয় যে, তিনি আজ রোযা রাখেননি।

হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিনের রোযাটি প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনের ঐসব রহমত ও বরকতে অংশ গ্রহণ করার জন্য হয়ে থাকে, যা আরাফার ময়দানে হাজীদের উপর অবতীর্ণ হয়। আর এর উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্র যেসব বান্দারা হজ্জে শরীক হতে পারেনি তারা যেন এ দিন রোযা রেখে এ দিনের বিশেষ রহমত ও বরকত থেকে কিছু না কিছু অংশ লাভ করে নেয়। অনুরূপভাবে ইয়াওমুন নাহ্র তথা কুরবানীর দিন হাজী ছাড়া অন্যদেরকে যে কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর রহস্যও অনেকটা এরকমই।

আশুরা দিবসের রোযাটি সকল নফল রোযার মধ্যে এ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে এটাই ছিল ফরয রোযা। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তখন এর ফরয হওয়ার বিধানটি রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবল নফলের পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পৃথক শিরোনামে কিছু হাদীস সামনে উল্লেখ করা হবে।

প্রতি মাসে তিন রোযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি

(١٢٢) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرِ وَ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ * (رواه النسائى)

১২২। হযরত হাফছা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারটি জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না। (১) আশুরার রোযা, (২) যিলহজ্জের (১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত) রোযা, (৩) প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা, (৪) ফজরের পূর্বের দু' রাকআত সুন্নত। — নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, এ চারটি জিনিস যদিও ফরয অথবা ওয়াজিব নয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে এত যত্নবান ছিলেন যে, কখনো এগুলো ছুটত না।

(١٢٣) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ * (رواه مسلم)

১২৩। মুআযাহ আদাবিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাসের কোন্ দিনগুলোতে তিনি এ রোযা রাখতেন ? আয়েশা উত্তর দিলেন, তিনি এ চিন্তা করতেন না যে, মাসের কোন দিনগুলোতে রোযা রাখবেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন হাদীসে প্রতি মাসের শুরুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিন দিন রোযা রাখার অভ্যাস ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ এবং অপর কোন কোন বর্ণনায় সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ তিন দিনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোনটাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল না। এর একটি কারণ তো এ ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সময় বাইরে সফর এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রয়োজন বেশী করে দেখা দিত। এগুলোর কারণে বিশেষ বিশেষ তারিখ ও দিনের নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জন্য উপযোগী ছিল না। দ্বিতীয় কারণ এটাও ছিল যে, তিনি যদি সর্বদা বিশেষ বিশেষ দিন ও তারিখে রোযা রাখতেন, তাহলে উম্মতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য এটা কষ্টের কারণ হয়ে যেত এবং এর দ্বারা এ ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারত যে, এ রোযাগুলো ওয়াজিব পর্যায়ের। সারকথা, এ জাতীয় কল্যাণ চিন্তার কারণে তিনি নিজে বিশেষ বিশেষ দিন ও তারিখের পাবন্দী করতেন না এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায় এটাই উত্তম ছিল। তবে সাহাবায়ে কেরামকে তিনি মাসের তিন রোযার ক্ষেত্রে অধিকতর আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের প্রতিই উৎসাহ দিতেন– যেমন, নিম্নের হাদীসগুলো দ্বারা এ বিষয়টি জানা যাবে।

আইয়ামে বীযের রোযা

(١٢٤) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ * (رواه الترمذى والنسائى)

১২৪। হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যর! তুমি যখন মাসে তিন দিন রোযা রাখতে চাও তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখ। —তিরমিযী, নাসায়ী

(প্রায় এ বিষয়বস্তুরই একটি হাদীস নাসায়ী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রাকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।)

(١٢٥) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ * (رواه ابوداؤد والنسائى)

১২৫। হযরত কাতাদা ইবনে মিলহান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন আইয়ামে বীয

অর্থাৎ, প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখি। আর তিনি বলতেন যে, প্রতিদান ও সওয়াবের দিক দিয়ে এটা সারা বছর রোযা রাখার মতই। —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এ পর্যন্ত যেসব হাদীস লিখা হয়েছে, এগুলো দ্বারা একটি বিষয় তো এ জানা গেল যে, প্রতি মাসে যে ঈমানদার বান্দা তিনটি নফল রোযা রেখে যায়, সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহমূলক বিধান অর্থাৎ, একে দশ-এর নিয়ম অনুসারে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াবের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি এ জানা গেল যে, এ রোযাগুলো যেন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা হয়। তৃতীয় বিষয়টি এ জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দ্বীনি স্বার্থ ও কল্যাণের খাতিরে নিজে এসব দিন ও তারিখের পাবন্দী করতেন না। আর তাঁর জন্য এটাই উত্তম ছিল।

আশুরার দিনের রোযা ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

প্রতি মাসে তিনটি নফল রোযা সম্পর্কে যে সব হাদীস পূর্বে আনা হয়েছে, এগুলোর কোন কোনটার মধ্যে আশুরার রোযার ফযীলত এবং এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সযত্ন প্রয়াস ও নিয়মানুবর্তিতার বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। এবার নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলো বিশেষভাবে এরই সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোর দ্বারা এ দিনের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও জানা যাবে।

(١٢٦) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় আসলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরা দিবসে রোযা রাখে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, (তোমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসাবে) এটা বিশেষ কি দিবস যে, তোমরা এতে রোযা পালন কর ? তারা বলল, এটা আমাদের কাছে এক মহান দিবস। এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছিলেন আর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা (আঃ) এ দিন রোযা রেখেছিলেন। এ জন্য আমরাও তাঁর অনুসরণে এ দিন রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মূসা (আঃ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক তোমাদের চাইতে বেশী এবং আমরাই এর অধিক হকদার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ দিন রোযা রাখলেন এবং উম্মতকেও এ দিনের রোযার হুকুম দিলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালায় বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনা গিয়েই আশুরার দিন রোযা রাখতে শুরু করেছিলেন। অথচ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশারই স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে ইসলামপূর্ব যুগেও আশুরা দিবসের রোযার প্রচলন ছিল এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মক্কার জীবনেও এ রোযা রাখতেন। তারপর যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন, তখন এখানে এসে নিজেও রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে এ দিনের রোযা রাখার হুকুম দিলেন।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, আশুরার দিনটি জাহিলিয়্যত যুগে মক্কার কুরাইশদের নিকটও খুবই সম্মানিত দিন ছিল। এ দিনই কা'বা শরীফে নতুন গিলাফ দেওয়া হত এবং কুরাইশের লোকেরা এ দিন রোযা পালন করত। অনুমান এই যে, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কিছু কথা-কাহিনী এ দিনের বেলায় তাদের কাছে সম্ভবত পৌঁছে ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ রীতি ছিল যে, কুরাইশের লোকেরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতকে জড়িয়ে যেসব ভাল কাজ করত তিনি এগুলোর মধ্যে তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন। এ ভিত্তিতেই তিনি হজ্জেও শরীক থাকতেন। অতএব, নিজের এ মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি আশুরার দিন কুরাইশদের সাথে রোযাও রাখতেন; কিন্তু অন্যদেরকে এর নির্দেশ দিতেন না। তারপর তিনি যখন মদীনায় আগমন করলেন এবং এখানকার ইয়াহুদীদেরকেও রোযা রাখতে দেখলেন এবং তাদের মুখে জানতে পারলেন যে, এটা হচ্ছে ঐ পবিত্র ঐতিহাসিক দিন, যে দিন মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, তখন তিনি এ দিনের রোযার প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করলেন। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে হুকুম দিলেন যে, তারাও যেন এ দিন রোযা রাখে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি এর জন্য এমন তাকীদপূর্ণ হুকুম দিয়েছিলেন, যেমন হুকুম ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে রুবায়্যি বিন্‌তে মুআওয়্যিয এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আশুরার দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে মদীনার আশেপাশের আনসারদের বসতি এলাকায় এ খবর পাঠালেন যে, যেসব লোক এখন পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করে নাই তারা যেন আজ রোযা রাখে, আর যারা পানাহার করে নিয়েছে তারাও যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকে এবং রোযাদারদের মত দিন কাটায়।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ইমাম ও ফকীহ্ এ কথা বুঝেছেন যে, প্রথমে আশুরার রোযা ফরয ছিল। পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার রোযার ফরযিয়্যত রহিত হয়ে গেল এবং এটা কেবল নফলের পর্যায়ে রয়ে গেল– যার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী এই মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে "আশুরার রোযার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" আশুরার রোযার ফরয হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস এটাই থাকল যে, তিনি রমযানের ফরয রোযার পর নফল রোযাগুলোর মধ্যে এর প্রতিই বেশী গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং এরই প্রতি অধিক যত্নশীল ছিলেন।

(١٢٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ * (رواه البخارى ومسلم)

contents

১২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন দিনকে অন্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এতে রোযা রাখতে দেখিনি, কেবল আশুরার দিন ও রমযানের মাস এর ব্যতিক্রম ছিল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব কর্মনীতি দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এটাই বুঝেছেন যে, নফল রোযার বেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনের প্রতি যে গুরুত্ব ও যত্ন দিতেন, অন্য কোন নফল রোযার বেলায় এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করতেন না।

(١٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهٖ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّهٗ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنْشَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (رواه مسلم)

১২৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিন রোযা রাখার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন (এবং অন্যদেরকেও এ দিন রোযা রাখার হুকুম দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দিনকে তো ইয়াহুদী ও নাসারাগণ বিরাট দিন হিসাবে পালন করে এবং এটা যেন তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় প্রতীক। তাই এ দিন রোযা রাখলে তাদের সাথে আমাদের হিস্যাদারী ও সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই এর মধ্যে কি এমন কোন পরিবর্তন আনা যায়, যার দ্বারা এ সাদৃশ্য আর বাকী না থাকে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইন্‌শাআল্লাহ, যখন আগামী বছর আসবে, তখন আমরা নবম তারিখে রোযা রাখব। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কিন্তু আগামী বছরের মুহাররম মাস আসার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তেকাল করে গেলেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ একথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের আপত্তি পেশ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের কিছুকাল পূর্বে এ কথাটি বলেছিলেন। এতটুকু পূর্বে যে, এর পর তাঁর জীবদ্দশায় মুহাররম মাস আর আসেই নাই, আর এজন্য এ নতুন সিদ্ধান্তের উপর আমল করা আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে সম্ভব হয়নি। কিন্তু উম্মত পথনির্দেশ পেয়ে গেল যে, এ ধরনের হিস্যাদারী ও সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা চাই। যেমন তিনি এ উদ্দেশ্যে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী বছর আমরা নবম তারিখে রোযা রাখব।

মুহাররম মাসের নয় তারিখে রোযা রাখার যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, এর দু'টি অর্থ হতে পারে। (১) আমরা আগামীতে ১০ তারিখের স্থলে ৯ই মুহাররম এ রোযা রাখব। (২) আগামীতে ১০ তারিখের সাথে আমরা ৯ তারিখেও রোযা রেখে নিব এবং এভাবে আমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের আমলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ দ্বিতীয় অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আশুরা দিবসের সাথে এর আগে নয়

তারিখের রোযাও রেখে নেওয়া চাই। আর যদি কোন কারণে নয় তারিখে রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তার পরের দিন অর্থাৎ, ১১ তারিখে রোযা রেখে নেওয়া হবে।

অধম সংকলন নিবেদন করছে যে, আমাদের যুগে যেহেতু ইয়াহুদী ও নাসারগণ আশুরা দিবসে (১০ই মুহাররম) রোযা রাখে না; বরং তাদের কোন কর্মকান্ডই চান্দ্র মাসের হিসাবে হয় না, তাই বর্তমানে কোন প্রকার সাদৃশ্যের প্রশ্নই থাকে না। অতএব, আমাদের যুগে সাদৃশ্য দূর করার জন্য ৯ তারিখে অথবা ১১ তারিখে রোযা রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। والله اعلم

যিলহজ্জের দশ দিন ও আরাফার দিনের রোযা

(١٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ * (رواه الترمذى)

১২৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যিলহজ্জের দশ দিনের এবাদত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন দিনের এবাদতের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। এই দশকের এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান গণ্য করা হয়, আর এক রাতের নফল এবাদত শবে ক্বদরের নফল এবাদতের সমান গণ্য করা হয়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এর আগেও এক হাদীসে প্রসঙ্গক্রমে যিলহজ্জের দশ দিনের নফল রোযার আলোচনা এসে গিয়েছে। আর সেখানে এ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ১লা যিলহজ্জ থেকে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৯ দিনের রোযা। কেননা, ঈদের দিনে তো রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

(١٣٠) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ * (رواه الترمذى)

১৩০। হযরত আবূ কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা পরবর্তী এক বছর ও পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ কাতাদার একটি দীর্ঘ হাদীস মুসলিম শরীফের বরাতে "প্রতি মাসে তিনটি রোযা" শিরোনামে আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে এই বিষয়বস্তুটিও প্রায় এমন শব্দমালায়ই এসেছে এবং সেখানে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আরাফার দিনের রোযার এ ফযীলত ও উৎসাহ দান ঐসব হাজীদের জন্য নয়, যারা হজ্জ পালনের জন্য আরাফার ময়দানে সমবেত হয়ে থাকেন; বরং তাদের জন্য সেখানে রোযা না রাখা উত্তম। আর সেখানেই এর হেকমত ও রহস্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা ঃ কোন কোন মানুষ ঐসব হাদীসে সন্দেহ করতে শুরু করে, যেগুলোর মধ্যে কোন আমলের সওয়াব ও প্রতিদান তাদের ধারণার চাইতে খুববেশী ও অসাধারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ হাদীসে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এর বরকতে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার আশা রয়েছে।" এ ধরনের সন্দেহের ভিত্তি হচ্ছে মহান দয়াময়ের দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়াময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে দিনের যে আমলের যত মূল্য নির্ধারণ করতে চান, তাই করতে পারেন। বছরের একটি রাত লাইলাতুল ক্বদরকে তিনি হাজার মাস অর্থাৎ, প্রায় ত্রিশ হাজার দিন ও রাতের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। এটা হচ্ছে তাঁর অপার অনুগ্রহ। সারকথা, হাদীস যদি সহীহ্ হয়, তাহলে এ ধরনের সংশয় মু'মিনের অন্তরে না আসা চাই।

পনেরই শা'বানের রোযা

(١٣١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرُ لَهٗ اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقُهٗ اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيْهِ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلَعَ الْفَجْرُ * (رواه ابن ماجة)

১৩১। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন পনেরই শা'বানের রাত আসে, তখন তোমরা এতে নফল নামায পড় আর দিনে রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ তাজাল্লী ও রহ্মত প্রথম আকাশে নেমে আসে। আর তিনি বলতে থাকেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী বান্দা আছে কি যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি যে, আমি তাকে রিযিক দান করব। কোন বিপদগ্রস্ত আছে কি যে, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দেব। এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তিনি বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন যে, তারা যেন এ সময় আমার কাছে কিছু চেয়ে নেয়। সুব্হে সাদেক পর্যন্ত আল্লাহ্ এভাবে ডাকতে থাকেন। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতেই অধিকাংশ ইসলামী শহর ও জনপদের দ্বীনদার মহলে পনেরই শা'বানের নফল রোযার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। এর একজন রাবী আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে হাদীস সমালোচক ইমামগণ এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, সে মনগড়া হাদীস তৈরী করত।

পনেরই শা'বানের রোযা সম্পর্কে তো কেবল এ একটি হাদীসই বর্ণিত রয়েছে, তবে শা'বানের পনের তারিখের রাতে নফল এবাদত ও দো'আ, এস্তেগফার সম্পর্কে কোন কোন হাদীসগ্রন্থে আরও কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন বর্ণনাই এমন নয়, যার সনদ মুহাদ্দিসদের নীতি ও মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হতে পারে। এতদসত্ত্বেও যেহেতু একাধিক হাদীস রয়েছে এবং বিভিন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, এজন্য ইবনে সালাহ প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন যে, সম্ভবত এর কোন ভিত্তি রয়েছে।

বিশেষ বিশেষ দিনের নফল রোযা

যেভাবে এ পর্যন্ত লিখা হাদীসসমূহের মধ্যে বছরের নির্দিষ্ট মাস এবং মাসের বিশেষ তারিখসমূহে নফল রোযা রাখার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে সপ্তাহের কোন কোন বিশেষ দিনেও রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দ্বারাও এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

(١٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ * (رواه الترمذى)

১৩২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। তাই আমি চাই যে, যেদিন আমার আমল পেশ করা হয়, সেদিন যেন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি। —তিরমিযী

(١٣٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ * (رواه الترمذى والنسائى)

১৩৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন। —তিরিমিযী, নাসায়ী

(١٣٤) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ * (رواه مسلم)

১৩৪। হযরত আবূ কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ আমি সোমবারেই জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সোমবারেই আমার উপর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, সোমবার দিনটি খুবই বরকত ও রহ্‌মতের দিন। এ দিনেই তোমাদের নবীর জন্ম হয়েছে এবং এ দিনেই আল্লাহ্‌র কিতাব অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে। তাই এ দিনের রোযার ব্যাপারে আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সোমবার দিন (কখনও কখনও অথবা অধিকাংশ সময়) রোযা রাখতেন, এর একটি কারণ তো তাই ছিল, যা উপরের হাদীসটিতে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ দিন আমল পেশ করা হয়, তাই তিনি চাইতেন যে, আমল পেশ করার দিন তিনি রোযাদার অবস্থায় থাকবেন। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল আল্লাহ্ তা'আলার ঐ দু'টি নেয়ামতের (জন্ম ও ওহী লাভ) শুকরিয়া অনুভূতি যা তিনি সোমবারেই লাভ করেছিলেন এবং যা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যও নেয়ামত ও রহ্‌মত। وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ।

(١٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ... قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ * (رواه الترمذى والنسائ)

১৩৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ... এমন খুব কমই হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার দিন রোযা ছাড়া থাকতেন। —তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় শুক্রবারে রোযাদার থাকতেন; কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি এ বিষয় থেকে নিষেধ করতেন যে, জুমু'আর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ এমন করতে শুরু করবে যে, নফল রোযা শুক্রবারেই রাখবে, আর রাত্রি জাগরণ ও এবাদতের জন্য শুক্রবারের রাতকেই নির্দিষ্ট করে নিবে।

(١٣٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ * (رواه مسلم)

১৩৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সপ্তাহের রাতগুলোর মধ্য থেকে শুক্রবারের রাতকে নফল নামায ও এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না এবং সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্য থেকে শুক্রবার দিনকে নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ো না। তবে যদি শুক্রবার এমন দিনে পড়ে যায়, যাতে তোমাদের কেউ এমনিতেই রোযা রাখে, (তাহলে এই শুক্রবারের রোযায় কোন দোষ নেই।) —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ জুমু'আর দিন এবং এর রাতের বিশেষ ফযীলতের কারণে যেহেতু এর খুব সম্ভাবনা ছিল যে, ফযীলত আকাঙ্ক্ষী লোকেরা এ দিন রোযা রাখার এবং এর রাতে জাগ্রত থাকা ও এবাদতের প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে বসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসটি ফরয ও ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি, এর সাথে ফরয ও ওয়াজিবের মতই ব্যবহার করা হবে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তাছাড়া এই নিষেধাজ্ঞার আরও কিছু কারণও ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন। যাহোক, এ নিষেধাজ্ঞাটি শরীঅতের সীমারেখা রক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্যই। উদ্দেশ্য এই যে, শুক্রবারের রোযা এবং রাত্রি জাগরণ যেন একটি অতিরিক্ত রসম ও রেওয়াজে পরিণত না হয়। والله اعلم

(١٣٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخَرِ الثُّلٰثَاءَ وَالْاَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ * (رواه الترمذى)

১৩৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এমনও করতেন যে,) এক মাসে যদি শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন, তাহলে অন্য মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখতেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর বর্ণনায়ই পূর্বে জানা গিয়েছে যে, মাসের তিন রোযার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। এজন্য হযরত আয়েশার এ হাদীসের অর্থ কেবল এটাই যে, তিনি এমনও করতেন যে, কোন এক মাসে কোন সপ্তাহের প্রথম তিন দিন, শনি, রবি ও সোমবার রোযা রেখে নিতেন, আর দ্বিতীয় মাসে পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রেখে নিতেন। (আর শুক্রবার দিন সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর বর্ণনা তো আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, শুক্রবার দিন তিনি অধিকাংশত রোযা রাখতেন।) তাই দেখা গেল, তিনি যেন ঐসব বিশেষ দিন ও তারিখ যেগুলোর রোযা রাখার বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এগুলো ছাড়াও সপ্তাহের প্রতিটি দিনে যেন তাঁর নফল রোযা পড়ে, এর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্র দেয়া প্রতিটি দিনই বরকতময় এবং এবাদতের দিন।

যেসব দিনে নফল রোযা রাখা নিষেধ

বছরে এমন কিছু বিশেষ দিনও রয়েছে, যেগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ। আল্লাহ্ তা'আলা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মালিক। তিনি নামাযকে মহান এবাদতও সাব্যস্ত করেছেন, আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে (যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সূর্যের মধ্যগগণে অবস্থানের সময়) নামায পড়তে নিষেধও করেছেন। তেমনিভাবে তিনি রোযাকে সবচেয়ে প্রিয় এবাদত এবং আত্মিক উন্নতির বিশেষ মাধ্যমও বানিয়েছেন, আবার কোন কোন বিশেষ দিনে এটাকে হারামও করে দিয়েছেন। আর এটাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচায়ক। বান্দার কাজ হচ্ছে নির্দেশ পালন এবং আনুগত্য করে যাওয়া।

(١٣٨) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩৮। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। —বুখারী, মুসলিম

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ * (رواه مسلم)

১৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। —মুসলিম

(١٤٠) عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاٰخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ * (رواه مسلم)

১৪০। ইবনে আযহার তাবেয়ীর আযাদকৃত গোলাম আবূ উবায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সাথে ঈদের নামায পড়লাম। তিনি এসে নামায পড়ালেন। নামায শেষে খুত্‌বা দিলেন এবং এতে বললেন, ঈদের এ দু'টি দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এগুলোর মধ্যে একটি দিন হচ্ছে (সারা মাস রোযা রাখার পর) তোমাদের (ঈদুল) ফিতরের দিন, আরেকটি হচ্ছে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়ার দিন। —মুসলিম

(١٤١) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ * (رواه مسلم)

১৪১। নুবাইশা হুযালী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আইয়ামে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহ্‌র স্মরণের দিন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে উল্লেখিত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর হাদীসগুলোতে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রোযা রাখতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর বক্তব্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা এজন্য নিষেধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দিনটিকে রমযানের পর 'ইফতারের দিন' অর্থাৎ, রোযা না রেখে পানাহার করার দিন বানিয়েছেন। এই কারণে এ দিন রোযা রাখাতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আর কুরবানীর দিন রোযা রাখা এজন্য নিষেধ যে, এটা হচ্ছে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়ার দিন। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় যেন এই যে, এ দিন আল্লাহর নামে যেসব কুরবানী করা হয়, আল্লাহর বান্দারা যেন এগুলোর গোশ্‌ত আল্লাহ্‌র মেহমানী মনে করে এবং তার দুয়ারের ভিখারী সেজে শুকরিয়ার সাথে খেয়ে নেয়। নিঃসন্দেহে ঐ বান্দা খুবই অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ বিবেচিত হবে, যে আল্লাহ্‌র এই আম মেহমানীর দিন জেনে শুনে রোযা রাখে। তথা পানাহার বর্জন করে আর যিলহজ্জের ১১ ও ১২ তারিখও যেহেতু কুরবানীর দিন, সুতরাং এগুলোর বিধানও তাই হবে। অর্থাৎ, এ দু'দিনও রোযা রাখা যাবে না। এদিকে নুবাইশা হুযালীর শেষ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর (সঃ) আইয়ামে তাশরীকের সবকটি দিনকেই পানাহার অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র মেহমানীর দিন বলেছেন, যার মধ্যে ১৩ই যিলহজ্জও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই ১০ ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ৪ দিনই রোযা রাখা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, এ দিনগুলোতে রোযা রাখা আর এবাদত হবে না; বরং গুনাহ্‌র কাজ হবে।

নফল রোযা ভাঙ্গাও যায়

রমযানের রোযা যদি শরীঅতসম্মত কোন ওযর ছাড়া ভেঙ্গে ফেলা হয়,তাহলে এর বিরাট কাফ্ফারাও আদায় করতে হয়, যার বিস্তারিত আলোচনা স্বস্থানে করা হয়েছে। কিন্তু নফল রোযা পালনকারী যদি ইচ্ছা করে, তাহলে রোযা ভাঙ্গতেও পারে এতে তার উপর কোন কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না এবং সে গুনাহ্গারও হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও নিজেও এমন করেছেন এবং অন্যদেরকেও এই মাসআলা জানিয়ে দিয়েছেন।

(١٤٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ قَالَ فَانِّي اِذًا صَائِمٌ ثُمَّ اَتَانَا يَوْمًا اُخَرَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ اَرِنِيْهِ فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ * (رواه مسلم)

১৪২। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কি খাওয়ার কোন জিনিস আছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি রোযা রেখে নিচ্ছি। তারপর আরেক দিন তিনি এভাবে আসলেন। আমি বললাম ঃ আজ আমাদের কাছে হাইস (খোরমা ও মাখনের পিঠা) হাদিয়া এসেছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে এটা দেখাও। আমি তো আজ রোযার নিয়্যত করে ফেলেছিলাম। এই বলে তিনি এখান থেকে কিছু খেয়ে নিলেন এবং রোযা আর রাখলেন না। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। (১) নফল রোযার নিয়্যত দিনেও করা যায়। (২) নফল রোযার নিয়্যত করে নেওয়ার পর যদি মত পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে এটা ভাঙ্গাও যায়। সামনের হাদীসগুলো থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে জানা যাবে।

(١٤٣) عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلٰى يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِيْنِه فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا * (رواه ابوداؤد والترمذى والدارمى)

১৪৩। হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন (যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন।) হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে বসে গেলেন। আর উম্মে হানী ছিলেন তাঁর ডান পাশে। এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে কিছু পানীয় নিয়ে আসল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম এবং তিনি এখান থেকে কিছু পান করে নিলেন। তারপর তিনি আবার এটা উম্মে হানীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উম্মে হানী এটা পান করে নিলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো রোযা ভেঙ্গে ফেললাম, অথচ আমি রোযাদার ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কোন ফরয অথবা ওয়াজিব রোযার কাযা করছিলে ?

উম্মে হানী বললেন, না, (কেবল নফল রোযা ছিল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ তাহলে কোন ক্ষতি নেই। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে কোন গুনাহ্ হয় না। এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দমালাও এসেছে ঃ اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهٖ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ (অর্থাৎ, নফল রোযা পালনকারীর এ এখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে রোযা পূর্ণ করবে, আর কোন কারণে যদি ভেঙ্গে ফেলতে চায়, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে।) উপরের দু'টি হাদীস থেকে এ বিষয়টি জানা যায় না যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর স্থলে পরে এই রোযা রাখতে হবে কি না। তবে সামনের হাদীসে এর কাযা করারও হুকুম রয়েছে।

নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা করতে হবে

(١٤٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اِقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ * (رواه الترمذى)

১৪৪। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং হাফসা (রাযিঃ) একবার নফল রোযা রেখেছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের সামনে কিছু খাবার আসল, যার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম এবং এখান থেকে কিছু খেয়ে ফেললাম। পরে হাফসা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দু'জন রোযাদার ছিলাম। পরে আমাদের সামনে কিছু খাবার আসল, যার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়ে গেলাম এবং এখান থেকে কিছু খেয়ে ফেললাম। (এবং এভাবে আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম।) তিনি বললেন ঃ এর স্থলে অন্য কোন দিন এর কাযা করে নিয়ো। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা হিসাবে অন্য সময় রোযা রেখে নিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর নিকট এই কাযা ওয়াজিব, আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব নয়, কেবল মুস্তাহাব।

تم كتاب الصوم والحمد لله

কিতাবুল হজ্জ

بسم الله الرحمن الرحيم

আগেই যেমন জানা গিয়েছে যে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধানের মধ্যে শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বিধান হচ্ছে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ। হজ্জ আসলে কি ? একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্‌র আশেকদের মত তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া, তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের ভক্তি ও ভালবাসার খেলা ও তাঁর রীতি-পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলন করে তাঁর মত ও পথের সাথে নিজের সংশ্লিষ্টতা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করা, নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী ইব্‌রাহীমী আবেগ-অনুভূতিতে অংশ গ্রহণ করা এবং নিজেকে তাঁরই রংয়ে রঙিয়ে তোলা।

আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার একটি শান এই যে, তিনি পরম প্রতাপশালী, আহ্‌কামুল হাকেমীন এবং সকল বাদশাহ্‌র বাদশাহ্, আর আমরা হচ্ছি তার অক্ষম ও মুখাপেক্ষী বান্দা এবং তাঁর মালিকানার গোলাম। আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় শানটি এই যে, তিনি ঐ সকল সৌন্দর্যগুণে ষোল আনা গুণান্বিত, যেগুলোর কারণে মানুষের মধ্যে কারও প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি; বরং কেবল তিনিই প্রকৃত প্রেমাস্পদ। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম (শাসক ও বাদশাহী) শানের দাবী এই যে, বান্দা তাঁর দরবারে আদব ও ভক্তির চিত্র হয়ে উপস্থিত হবে। ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যবহারিক রুকন নামায এরই বিশেষ প্রতিচ্ছবি এবং এতে এই রূপটিই প্রবল। আর যাকাতও এই সম্পর্কেরই অন্য একটি দিককে প্রকাশ করে।

আল্লাহ্ তা'আলার দ্বিতীয় শান (প্রেমাস্পদ হওয়া)-এর দাবী এই যে, তাঁর সাথে বান্দার ভালবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক থাকবে। রোযার মধ্যেও এর কিছুটা রূপ লক্ষ্য করা যায়। পানাহার ত্যাগ করে দেওয়া এবং নফ্‌সের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা প্রেম ও ভালবাসারই একটি অধ্যায়। কিন্তু হজ্জ হচ্ছে এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সেলাই করা কাপড়ের স্থলে একটি কাফন সদৃশ পোশাক পরিধান করা, খালি মাথায় থাকা, ক্ষৌরকার্য না করা, নখ না কাটা, চুলে চিরুনি ব্যবহার না করা, তেল না লাগানো, সুগন্ধি ব্যবহার না করা, চিৎকার করে করে লাব্বাইক বলা, বায়তুল্লাহ্‌র চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা, এর এক কোণে রাখা কালো পাথরে (হাজরে আসওয়াদ) চুমু খাওয়া, এর দরজা ও দেয়ালে আঁকড়ে ধরা ও রোনাজারী করা, তারপর সাফা-মারওয়ায় চক্কর দেওয়া, তারপর মক্কা শহর থেকেও বের হয়ে যাওয়া এবং কখনও মিনায়, কখনও আরাফাতে আর কখনও মুযদালিফার প্রান্তরে গিয়ে পড়ে থাকা, তারপর আবার জামারাতে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা– এসকল কাজ ও আচরণ ঠিক তাই, যা প্রকৃত

প্রেমিকদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম যেন এই প্রেমরীতির উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর এই প্রেমিকসুলভ কাজগুলো এমন পছন্দ হয়েছে যে, তিনি আপন দরবারের বিশেষ উপস্থিতি তথা হজ্জ ও উমরার আরকান ও আমল এগুলোকেই সাব্যস্ত করেছেন। এসব কাজের সমষ্টিরই নাম যেন হজ্জ– যা ইসলামের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের রুকন।

এ মা'আরিফুল হাদীস সিরিজের প্রথম খন্ড কিতাবুল ঈমানে ঐসব হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ইসলামের পঞ্চ আরকানের বর্ণনা রয়েছে এবং এগুলোর শেষ রুকন বায়তুল্লাহ্র হজ্জকে বলা হয়েছে।

হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী নবম হিজরীতে এসেছে এবং পরবর্তী বছর দশম হিজরীতে নিজের ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিরাট জামা'আতসহ হজ্জ আদায় করেন– যা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ। এ বিদায় হজ্জেই আরাফার ময়দানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিসমাপ্ত করে দিলাম। এ আয়াতে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, হজ্জ হচ্ছে ইসলামের পরিপূর্ণতা দানকারী রুকন।

কোন বান্দার ভাগ্যে যদি সঠিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হজ্জ নছীব হয়ে যায়– যাকে শরীঅতের ভাষায় 'হজ্জে মাবরুর' বলা হয় এবং সে যদি ইব্‌রাহীমী ও মুহাম্মদী সম্পর্কের সামান্য অংশও লাভ করতে পারে, তাহলে সে যেন সৌভাগ্যের উঁচু মর্তবা লাভ করে নিল এবং ঐ মহান নেয়ামত তার হাতে এসে গেল– যার চাইতে বড় কোন নেয়ামতের কল্পনাও এ দুনিয়াতে করা যায় না। সে তখন এ নেয়ামতের শুকরিয়া হিসাবে বলতে পারে এবং জোশ ও উন্মত্ততার সাথে বলতে পারে ঃ

نازم بچشم خود كه جمال تو ديده است * افتم به پائے خود كه بكويت اسيده است

هردم هزار بوسه زنم دست خويش را * كه دامنت گرفته بسويم كشيده است

আমি আমার এ চোখ নিয়ে গর্ব করতে পারি যে, সে তোমার সৌন্দর্য দর্শন করেছে, আমার পা দু'টি নিয়েও আমি গর্বিত যে, এগুলো তোমার গলিতে পৌঁছেছে। প্রতি মুহূর্তে আমি নিজের হাতে হাজার চুমু খাই, এজন্য যে, সে তোমার আঁচল ধরে আমার দিকে তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছে।

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এবার হজ্জ সম্পর্কে নিম্নের হাদীসগুলো পাঠ করে নিন।

হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা ও এর ফযীলত

(١٤٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلٰثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ

وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَاءِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ *

(رواه مسلم)

১৪৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং এতে বললেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা হজ্জ আদায় কর। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছরই কি হজ্জ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি সে তিনবার একই প্রশ্ন করতে থাকল। শেষে তিনি (কিছুটা অসন্তুষ্টির সাথে) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম, তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত, অথচ তোমরা তা করতে পারতে না। তারপর বললেন, কোন ব্যাপারে আমি নিজে যে পর্যন্ত কোন নির্দেশ না দেই, সে পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে দাও (এবং প্রশ্ন করে করে নিজেদের উপর কাঠিন্য আরোপ করার চেষ্টা করো না) কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কাছে বেশী প্রশ্ন করে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী এটা পালন করে যাও, আর যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা পরিহার কর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযী শরীফ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে প্রায় এ বিষয়বস্তুরই একটি হাদীস হযরত আলী (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে হজ্জ ফরয হওয়ার এ ঘোষণা এবং এর উপর হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত এই প্রশ্নোত্তরটি সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হয়েছিল ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা ফরয— তাদের উপর, যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে ঐ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রতি বছরই কি হজ্জ করা ফরয?" কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এক হাদীসে (যা ইমাম আহমাদ, নাসায়ী ও দারেমী বর্ণনা করেছেন) এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এ প্রশ্নকারী ছিলেন আকরা ইবনে হাবেস তামীমী। তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার তেমন সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। এ কারণেই তিনি এভাবে প্রশ্ন করে বসেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না, তখন তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ "আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম, তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত।" এর উদ্দেশ্য ও মর্ম এই যে, প্রশ্নকারীকে এটা চিন্তা করা ও বুঝা উচিত ছিল যে, আমি হজ্জ ফরয হওয়ার যে নির্দেশ শুনিয়েছি, এর দাবী ছিল জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা। তারপর এমন প্রশ্ন করার ফল এটাও হতে পারত যে, আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম (আর এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি হ্যাঁ, তখনই বলতেন, যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর হুকুম থাকত।) তাহলে প্রতি বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত এবং উম্মত খুবই

মুশকিলে পড়ে যেত। তারপর তিনি বললেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের অনেকেই বেশী বেশী প্রশ্ন করা ও বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়ার মন্দ অভ্যাসের কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের নবীর কাছে প্রশ্ন করে করে শরীঅতের বাধ্যবাধকতা তারা অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর এগুলোর উপর আর আমল করতে পারে নি।

হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা যতদূর সম্ভব এটা পালন কর, আর যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ কর।" মর্ম এই যে, আমার আনীত শরীঅতের মেযাজ বা প্রকৃতি কঠোরতা ও সংকীর্ণতা নয়; বরং সহজ ও উদারতা। তাই তোমাদের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব তোমরা এটা পালন করার চেষ্টা করে যাও। মানবীয় দুর্বলতার কারণে এতে যে ত্রুটি থেকে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এর ক্ষমার আশা করা যায়।

(١٤٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَالِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً * (رواه الترمذى)

১৪৬। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফরের এমন পাথেয় ও বাহনের মালিক হল যা তাকে আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, অথচ সে হজ্জ করল না, সে ইয়াহুদী হয়ে মরুক অথবা নাসারা হয়ে মরুক, এতে কিছু আসে যায় না। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা ফরয– যারা সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ঐসব লোকের জন্য কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে, যারা হজ্জ করার শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে না। বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা আর ইয়াহুদী অথবা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করা যেন সমান। (নাঊযুবিল্লাহ্) এটা ঐ ধরনের হুশিয়ারীই, যেমন, নামায পরিত্যাগ করাকে কুফর ও শিরকের কাছাকাছি বিষয় বলা হয়েছে। কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ اَقِيْمُو الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা একটি মুশরিকসুলভ কাজ।

হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদেরকে মুশরিকদের সাথে উপমা না দিয়ে ইয়াহুদী ও নাছারাদের সাথে উপমা দেওয়ার রহস্য এই যে, হজ্জ না করা ইয়াহুদী ও নাসারাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। কেননা, আরবের মুশরিকরা হজ্জ করত, তবে তারা নামায পড়ত না। এ জন্য নামায ত্যাগ করাকে মুশরিকসুলভ কর্ম বলা হয়েছে।

এ হাদীসে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের জন্য যে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, এর জন্য সূরা আলে ইমরানের ঐ আয়াতের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً কিন্তু বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারী বরাত হিসাবে কেবল আয়াতটির প্রথম অংশই উল্লেখ করেছেন। আসলে

আয়াতের যে অংশ দ্বারা হুশিয়ারী বুঝা যায়, সেটা হচ্ছে সামনের অংশ অর্থাৎ, وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (যার অর্থ এই যে, এ নির্দেশের পর যে ব্যক্তি কাফের সুলভ নীতি অবলম্বন করবে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন পরওয়া নেই, তিনি সকল সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী। এতে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের এ কর্মনীতিকে مَنْ كَفَرَ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে এবং اِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ এর হুশিয়ারী শোনানো হয়েছে। এর মর্ম এটাই হল যে, এমন অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য মানুষ যা কিছুই করুক এবং যে অবস্থায়ই মারা যাক, এতে আল্লাহ্‌র কোন পরওয়া নেই।

প্রায় এ বিষয়বস্তুরই অন্য একটি হাদীস মুসনাদে দারেমীতে হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

(١٤٧) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ * (رواه الترمذى وابن ماجة)

১৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিনিস হজ্জকে ওয়াজিব করে দেয়? তিনি উত্তরে বললেন : সফরের পাথেয় ও বাহন। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা : কুরআন মজীদে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে : مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ, হজ্জ ঐসব লোকদের উপর ফরয, যারা সফর করে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। এখানে যে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত প্রশ্নকারী সাহাবী এটা স্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ সামর্থ্যের নির্দিষ্ট মাপকাঠি কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, একটি জিনিস তো এই যে, যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে, যার দ্বারা মক্কা শরীফ পর্যন্ত সফর করা যায়। দ্বিতীয় জিনিসটি এই যে, পানাহারের পাশাপাশি প্রয়োজনের জন্য এতটুকু সম্পদ থাকতে হবে, যা ঐ সফরকালীন সময়ের খরচের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ফুকাহায়ে কেরাম এ খরচের মধ্যে ঐসব লোকদের খরচকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হজ্জ গমণকারীর উপর ওয়াজিব।

(١٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং এতে কোন অশ্লীল কাজ ও নাফরমানী করল না, সে হজ্জ থেকে ঐ দিনের মত আবিলতামুক্ত হয়ে ফিরে আসবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। —বুখারী, মুসিলম

ব্যাখ্যা : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

আয়াতে হজ্জ পালনকারীদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন বিশেষভাবে হজ্জের সময়ে অশ্লীল বিষয়াদি ও আল্লাহ্র নাফরমানীর সকল কাজ এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে এই দিকনির্দেশনার উপর আমলকারীদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ করবে এবং হজ্জের দিনগুলোতে সে কোন অশ্লীল কাজও করবে না, আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতামূলক এমন কোন কাজও করবে না, যা ফাসেকীর সীমায় এসে যায়, তাহলে হজ্জের বরকতে তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে এবং সে এমন পাক পবিত্র হয়ে হজ্জ থেকে ফিরবে, যেমন, সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিল। আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে এ সম্পদ নছীব করুন।

(١٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি উমরা থেকে অপর উমরা এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্র কাফ্ফারা স্বরূপ। আর পুণ্যময় হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। —বুখারী, মুসলীম

(١٥٠) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ * (رواه الترمذى والنسائى)

১৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে কর। কেননা, এ দু'টি জিনিস দারিদ্র্য ও গুনাহ্কে এভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর পুণ্যময় হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। —তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে হজ্জ অথবা উমরা আদায় করে, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মতের দরিয়ায় ডুব দিয়ে গোসল করে। যার ফলে সে গুনাহ্র নাপাক প্রভাব থেকে পাক হয়ে যায়। এছাড়া দুনিয়াতেও তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহ হয় যে, সে অভাব-অনটন ও পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং স্বচ্ছলতা ও মানসিক প্রশান্তি তার ভাগ্যে জুটে যায়। তদুপরি হজ্জে মাবরুরের বিনিময়ে জান্নাত লাভ হওয়া তো আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত ফায়সালা।

(١٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ * (رواه ابن ماجة)

১৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ হজ্জ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহ্র মেহ্মান। তারা যদি আল্লাহ্র

contents

কাছে দো'আ করে, তাহলে তিনি তা কবূল করেন, আর যদি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। —ইবনে মাজাহ্

(١٥٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ * (رواه احمد)

১৫২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন হাজীর সাথে সাক্ষাত কর, তখন সে তার বাড়ীতে পৌঁছার আগেই তাকে সালাম দাও, তার সাথে মুসাফাহা কর এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ কর। কেননা, তার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে গিয়েছে। (তাই তার দো'আ কবূল হওয়ার প্রবল আশা করা যায়।) —মুসনাদে আহমাদ

(١٥٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহ্র পথে জেহাদের জন্য বের হল, তারপর রাস্তায়ই মারা গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুজাহিদ, হাজী ও উমরাকারীর জন্য নির্ধারিত সওয়াবই দান করবেন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহমূলক বিধান ও আইনের ঘোষণা স্বয়ং কুরআন মজীদেও দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হল, তারপর (পথেই) তার মৃত্যু এসে গেল, এমতাবস্থায় তার প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট নির্ধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা ঃ রুকূ ঃ ১৪)

এর দ্বারা জানা গেল যে, কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কাজ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় এবং এটা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে পথেই তার জীবন শেষ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ কাজের পূর্ণ প্রতিদান ঐ বান্দার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার রহমের দাবী। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

মীকাত, এহ্রাম ও তালবিয়া প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা কাবা শরীফকে ঈমানদারদের কেবলা এবং নিজের সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ ঘর বানিয়েছেন। আর আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব লোক সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর জীবনে একবার সেখানে উপস্থিত হওয়া এবং হজ্জ করা ফরয করে দিয়েছেন। এর সাথে এ উপস্থিতি ও হজ্জের জন্য কিছু অপরিহার্য আদাব ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে একটি নিয়ম এই যে, আল্লাহ্র ঘরের হজ্জের জন্য যে সেখানে

উপস্থিত হবে, সে দৈনন্দিনের সাধারণ পরিধেয় কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ কোন পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হবে না; বরং এমন দরিদ্রের মত লেবাস নিয়ে হাজির হবে, যা মুর্দার কাফনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামা, পায়জামা, কটি, শেরওয়ানী, কোট ইত্যাদি কিছুই গায়ে থাকবে না। কেবল একটি লুঙ্গি পরনে থাকবে, আর একটি চাদর শরীরের উপরিভাগে ফেলে রাখবে। মাথাও খোলা থাকবে, পায়ে মোজা; বরং এমন জুতাও থাকতে পারবে না– যা দ্বারা পা সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। (অবশ্য মহিলাদের বেলায় তাদের পর্দার খাতিরে সেলাই করা কাপড় পরিধান, মাথা ঢাকা ও পায়ে মোজা ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে।) এ ধরনের আরও কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা সেখানে যেন এমন আকৃতি ও অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হয়, যার দ্বারা তার অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তার অনাসক্তি প্রকাশ পায়।

তবে বান্দাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তাদের উপর এ নির্দেশ আরোপ করা হয়নি যে, তারা নিজেদের বাড়ী থেকেই এহ্‌রাম বেধে এসব নিয়ম পালন করতে করতে যাত্রা শুরু করবে। যদি এমন নির্দেশ দেওয়া হত, তাহলে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য সমস্যা হয়ে যেত। কিছুদিন পূর্বেও অনেক দেশের হাজীগণ মাসকে মাস সফর করার পর মক্কা শরীফে গিয়ে পৌছতেন। বর্তমানেও কোন কোন দেশের হাজীরা কয়েক সপ্তাহের স্থলপথের ও জলপথের সফর করে সেখানে পৌঁছে থাকেন। এ কথা স্পষ্ট যে, এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এহ্‌রামের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করে চলা অধিকাংশ লোকের জন্য বিরাট কঠিন বিষয় হয়ে যেত। এ জন্য বিভিন্ন পথে আগত হাজীদের জন্য মক্কা শরীফের কাছে বিভিন্ন দিকে কিছু স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জ অথবা উমরা পালনের জন্য আগমনকারীরা যখন এসব স্থানে পৌঁছবে, তখন 'বায়তুল্লাহ' ও 'পবিত্র নগরী' এর আদব রক্ষার্থে সেখান থেকেই এহ্‌রামধারী হয়ে যাবে। বিভিন্ন দিকের এ নির্দিষ্ট স্থানগুলোকে 'মীকাত' বলা হয়– যার বিস্তারিত পরিচয় সামনে আসবে।

এ কথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, এহ্‌রাম বাঁধার অর্থ কেবল এহ্‌রামের কাপড় পরিধান করা নয়; বরং এহ্‌রামের কাপড় পরিধান করে প্রথমে দু'রাকআত এহ্‌রামের নামায পড়তে হয়। তারপর উঁচু গলায় তালবিয়া পাঠ করতে হয়ঃ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ এ তালবিয়া পাঠ করার পর মানুষ মুহ্‌রিম হয়ে যায় এবং এর দ্বারাই হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আর এর দ্বারাই এহ্‌রামজনিত সকল বাধ্যবাধকতা তার উপর আরোপিত হয়, যেভাবে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার পর নামাযের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং নামাযের সকল বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়।

এ ভূমিকার পর এবার মীকাত, এহ্‌রাম ও তালবিয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নলিখিত হাদীসগুলো পাঠ করে নিন ঃ

মীকাত

(١٥٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ

اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১৫৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়ফা'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন, শামবাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন 'জুহ্ফা'কে, নজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল'কে, আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে। অতএব, এ চারটি স্থান স্বয়ং এর অধিবাসীদের জন্য মীকাত এবং ঐসব লোকদেরও মীকাত, যারা অন্য অঞ্চল থেকে এ পথ ধরে আসবে– যারা হজ্জ অথবা উমরার ইচ্ছা রাখে। আর যারা এ সীমার ভিতরে থাকে, তারা নিজেদের ঘর থেকেই এহ্রাম বাঁধবে এবং এ নিয়ম এভাবেই চলবে। এমনকি মক্কার লোকেরা মক্কা থেকেই এহ্রাম বাঁধবে। —বুখারী, মুসলিম

(١٥٥) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيْقِ الْاٰخَرِ الْجُحْفَةُ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمَهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ * (رواه مسلم)

১৫৫। হযরত জাবের (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত হচ্ছে 'যুলহুলায়ফা' অন্য পথে (অর্থাৎ, শামের পথে গেলে) 'জুহ্ফা', ইরাকবাসীদের মীকাত হচ্ছে 'যাতে ইর্ক', নজদবাসীদের মীকাত হচ্ছে 'কারনুল মানাযিল', আর ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে 'ইয়ালাম্লাম'। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে কেবল চারটি মীকাতের উল্লেখ রয়েছে। (১) যুল হুলায়ফা, (২) জুহ্ফা, (৩) কারনুল মানাযিল, (৪) ইয়ালাম্লাম। আর হযরত জাবের বর্ণিত এ হাদীসে পঞ্চম মীকাত হিসাবে 'যাতে ইর্ক' এরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাকে ইরাকবাসীদের মীকাত বলা হয়েছে। দু'টি রেওয়ায়াতের মধ্যে আরেকটি সামান্য পার্থক্য এও রয়েছে যে, প্রথম রেওয়ায়াতে জুহ্ফাকে শামবাসীদের মীকাত বলা হয়েছে, আর অপর বর্ণনায় এটাকে অন্য পথে আগমনকারীদের মীকাত বলা হয়েছে– যার অর্থ বাহ্যত এই যে, মদীনাবাসীরাও যদি অন্য পথে (অর্থাৎ, জুহ্ফার পথ ধরে) মক্কা শরীফ যায়, তাহলে তারা জুহ্ফা থেকেও এহ্রাম বাঁধতে পারে। আর তাদের ছাড়া অন্য এলাকার যেসব লোক যেমন, শামবাসীরা যদি জুহ্ফার দিক থেকে আসে, তাহলে তারাও জুহ্ফা থেকেই এহ্রাম বাঁধবে। কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা অন্য পথে আগমনকারী দ্বারা শামবাসীদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কেবল ভাষা ও শব্দের পার্থক্য থাকবে। যাহোক, এ পাঁচটি স্থান হচ্ছে নির্ধারিত ও সর্বসম্মত মীকাত। যেসব এলাকার জন্য এগুলোকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছিল, এগুলো মক্কা আগমনকারীদের পথে পড়ত। এসব স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই ঃ

যুল্ হুলায়ফা ঃ এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা মুকার্‌রামা যাওয়ার পথে মাত্র ৫/৬ মাইলের মাথায় পড়ে। এটা মক্কা শরীফ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। এখান থেকে মক্কা শরীফ প্রায় ২০০ মাইল; বরং আজকালকার পথে প্রায় ২৫০ মাইল।

যেহেতু মদীনাবাসীর দ্বীনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, এজন্য তাদের মীকাতও এত দূরত্বে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা যত বেশী তাকে কষ্টও তত বেশী করতে হয়।

জুহ্‌ফা ঃ এটা শাম ইত্যাদি পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা থেকে আগত লোকদের মীকাত। এটা বর্তমানে 'রাবেগ'-এর নিকটবর্তী একটি জনপদ ছিল। বর্তমানে এ নামের কোন জনপদ নেই। তবে এতটুকু জানা যায় যে, এর অবস্থান রাবেগের কাছেই ছিল, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে সমুদ্র তীরের কাছে অবস্থিত।

কারনুল মানাযিল ঃ এটা নজ্‌দ অঞ্চলের দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ মাইল পূর্ব দিকে নজদগামী রাস্তার উপর এটি একটি ছোট পাহাড়।

যাতে ইর্‌ক ঃ এটা ইরাক থেকে আগমনকারীদের মীকাত। মক্কা শরীফ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ইরাকগামী রাস্তার উপর অবস্থিত। এর দূরত্ব মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৫০ মাইলের মত।

ইয়ালাম্‌লাম ঃ এটা ইয়ামানের দিক থেকে আগমনকারী লোকদের মীকাত। এটা তিহামার পাহাড়সমূহের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়– যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ইয়ামান থেকে মক্কাগামী রাস্তায় পড়ে।

উপরের দু'টি হাদীস মারফত আগেই জানা গিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাঁচটি স্থানকে এগুলোর অধিবাসীদের জন্য এবং অন্যান্য এলাকার ঐসব লোকদের জন্য— যারা হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে এসব স্থান অতিক্রম করে আসবে, তাদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উম্মতের ফকীহ্‌দের এ কথার উপর এজমা ও ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার জন্য এসব স্থানের যে কোন একটি দিয়ে আসবে, তার জন্য এটা জরুরী যে, সে এহ্‌রাম বেঁধে এ স্থান থেকে সামনে অগ্রসর হবে। এহ্‌রাম বাঁধার অর্থ ও এর নিয়ম-পদ্ধতি এইমাত্র উল্লেখ করে আসা হয়েছে।

এহ্‌রামের পোশাক

(١٥٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَالْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ * (رواه البخارى ومسلم)

১৫৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কি কি কাপড় পরিধান করতে পারবে? তিনি বললেন ঃ (এহ্‌রাম অবস্থায়) তোমরা জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, শেলওয়ার পরবে

না, টুপি পরবে না এবং জুতাও পরবে না। তবে কেউ যদি স্যান্ডেল না পায়, তাহলে সে জুতাই পরে নিবে, কিন্তু এগুলো টাখনুর নীচ দিক থেকে কেটে নিবে। আর তোমরা এমন কাপড়ও পরিধান করবে না, যার মধ্যে জাফরান অথবা ওয়ারস লাগান হয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে, জামা, শেলওয়ার, পাগড়ী ইত্যাদি কেবল কয়েকটি কাপড়ের নাম নিয়েছেন, যেগুলোর সে সময় প্রচলন ছিল। এ বিধানই প্রযোজ্য হবে ঐসব কাপড়ের বেলায়, যেগুলো বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে ও বিভিন্ন দেশে এসব উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে– যেসব উদ্দেশ্যের জন্য জামা, শেলওয়ার ও পাগড়ী ইত্যাদি ব্যবহার করা হত।

জাফরান তো একটি প্রসিদ্ধ জিনিস, ওয়ারসও এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত কমলা রঙের পাতা। এ দু'টি জিনিসই যেহেতু সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হত, এজন্য এহ্‌রাম অবস্থায় এমন কাপড় পরিধান করতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে জাফরান অথবা ওয়ারসের স্পর্শ লেগেছে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, "মুহরিম ব্যক্তি কেমন কাপড় পরিধান করবে ?" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ "অমুক অমুক কাপড় পরতে পারবে না।" এ উত্তরে তিনি যেন একথাও শিখিয়ে দিলেন যে, জিজ্ঞাসা করার বিষয় এটা নয় যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরবে; বরং এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, তার জন্য কোন ধরনের কাপড় পরা নিষেধ। কেননা, এহ্‌রামের প্রভাব এটাই পড়ে থাকে যে, কোন কোন কাপড় ও কোন কোন জিনিস যেগুলোর ব্যবহার সাধারণ অবস্থায় জায়েয থাকে– এহ্‌রামের কারণে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ জন্য এটা জিজ্ঞাসা করা চাই যে, এহ্‌রাম অবস্থায় কোন্ কোন্ কাপড় ও কোন্ কোন্ জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হয়ে যায়।

(١٥٧) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَامَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَالِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ اَوْ خَزٍّ اَوْ حُلِيٍّ اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصٍ اَوْ خُفٍّ * (رواه ابوداؤد)

১৫৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি মহিলাদেরকে এহ্‌রাম অবস্থায় হাতমোজা পরিধান করতে, চেহারায় নেকাব পরতে এবং ওয়ারস ও জাফরান লাগান কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করতেন। এগুলো বাদে তারা যে কোন রঙয়ের কাপড় পরতে পছন্দ করে তাই পরতে পারে– কুসুম রঙয়ের কাপড় হোক অথবা রেশমী কাপড়। তেমনিভাবে তারা ইচ্ছা করলে অলংকারও পরিধান করতে পারে এবং শেলওয়ার, জামা, মোজাও পরতে পারে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, এহ্‌রাম অবস্থায় জামা, শেলওয়ার ইত্যাদি সেলাই করা কাপড় পরিধানের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এটা কেবল পুরুষদের বেলায়। মহিলারা পর্দার খাতিরে এসব কাপড় ব্যবহার করতে পারবে এবং মোজাও পরতে পারবে। তবে হাতমোজা পরা তাদের জন্যও নিষেধ এবং মুখে নেকাব পরাও নিষেধ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা ভিন্ন পুরুষের সামনেও মুখ একেবারে খোলা রাখবে। হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে

মুখে দস্তুরমত নেকাব পরে থাকতে; কিন্তু কোন ভিন্ন পুরুষের মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজের চাদর অথবা অন্য কোন জিনিস দিয়ে মুখ আড়াল করে নিতে হবে। আবূ দাঊদ শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়াত রয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, "আমরা কিছু মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম। (এহ্‌রামের কারণে আমরা মুখে নেকাব পরতাম না।) কিন্তু যখন পুরুষরা আমাদের সামনে দিয়ে যেত, তখন আমরা আমাদের চাদরটিই মাথার উপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিতাম এবং এভাবে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতাম। তারপর পুরুষরা যখন আমাদেরকে অতিক্রম করে যেত, তখন আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলে দিতাম।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ বর্ণনা দ্বারা একথাটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদের জন্য নেকাব ব্যবহার করা নিষেধ; কিন্তু যখন ভিন্ন পুরুষদের সামনে পড়ে যাবে, তখন চাদর অথবা অন্য কোন জিনিস দিয়ে মুখ আড়াল করে নিতে হবে।

এহ্‌রামের পূর্বে গোসল করা

(١٥٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِاِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ * (رواه الترمذى والدارمى)

১৫৮। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহ্‌রামের জন্য কাপড় খুলে গোসল করতে দেখেছেন। —তিরমিযী, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে এহ্‌রামের পূর্বে গোসল করাকে সুন্নত বলা হয়েছে। তবে কেউ যদি এহ্‌রামের দু'রাকআত নামাযের জন্য কেবল ওযূ করে নেয়; তাহলে এটাও যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং তার এহ্‌রাম শুদ্ধ গণ্য হবে।

এহ্‌রামের তালবিয়া

(١٥٩) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَايَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৫৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, আর তখন তাঁর মাথার চুলগুলো জড়ানো ছিল। (যেমন, গোসলের পর মাথার চুলের অবস্থা এমনই থাকে।) তিনি এভাবে তালবিয়া পাঠ করেছিলেন ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

তিনি কেবল এ বাক্যগুলোই পড়ছিলেন, এর উপর অন্য কোন বাক্য সংযোজন করেছিলেন না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নিজ বান্দাদেরকে হজ্জ অর্থাৎ, তাঁর মহান দরবারে উপস্থিতির আহ্বান জানিয়েছিলেন– (যার উল্লেখ কুরআন মজীদেও রয়েছে।) তাই হজ্জ যাত্রী বান্দা যখন এহ্রাম বেঁধে এ তালবিয়া পাঠ করে, তখন যেন সে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঐ আহ্বান ও আল্লাহ্ তা'আলার ঐ দাওয়াতের উত্তরে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার দরবারে উপস্থিতির জন্য ডাক দিয়েছিলে এবং নিজের বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলে। তাই আমি হাজির, লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।

এহ্রামের প্রথম তালবিয়া কখন পড়বে

(١٦٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৬০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুল হুলায়ফার মসজিদে এহ্রামের দু'রাকআত নামায পড়ার পর) যখন মসজিদের পাশেই উটনীর রেকাবে পা রাখতেন এবং উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তখন তিনি এহ্রামের তালবিয়া পড়তেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা ও তাদের বক্তব্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে এহ্রামের প্রথম তালবিয়া কোন্ সময় ও কোন্ স্থানে পড়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর বর্ণনা (যেমন, এ হাদীসেও উল্লেখিত রয়েছে।) এই যে, যুল হুলায়ফার মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার পর সেখানেই তিনি নিজ উটনীর উপর সওয়ার হলেন এবং উটনী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল, তখন তিনি এহ্রামের প্রথম তালবিয়া পাঠ করলেন এবং এ সময় থেকেই তিনি যেন মুহ্রিম হয়ে গেলেন। অপরদিকে অন্য কোন সাহাবীর বর্ণনা এই যে, যখন তিনি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে কিছু সামনে অগ্রসর হলেন এবং 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন (যা যুল হুলায়ফার একেবারে নিকটে কিছুটা উঁচু স্থান ছিল।) তখন তিনি এহ্রামের প্রথম তালবিয়া পাঠ করলেন। আর কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, যখন তিনি যুল হুলায়ফার মসজিদে এহ্রামের দু'রাকআত নামায পড়লেন, তখন ঐ সময়েই উটনীর উপর সওয়ার হওয়ার আগেই এহ্রামের প্রথম তালবিয়া পাঠ করে নিলেন।

আবু দাউদ শরীফ ও মুস্তাদরকে হাকেম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়েরের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে সাহাবায়ে কেরামের এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ "আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলায়ফার মসজিদে এহ্রামের দু'রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথেই প্রথম তালবিয়া পাঠ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়টি কেবল ঐ কয়েকজন জানতে পারলেন, যারা তখন তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। এরপর যখন তিনি সেখানে উটনীর উপর সওয়ার হলেন এবং উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল, তখন তিনি আবার তালবিয়া পাঠ করলেন এবং উটনীর উপর সওয়ার হওয়ার পর এটা ছিল তাঁর প্রথম তালবিয়া। তাই যেসব লোক তাঁর এ তালবিয়া শুনেছিল এবং

প্রথমটি শুনে নাই তারা মনে করল যে, প্রথম তালবিয়া তিনি উটনীর উপর সওয়ার হয়েই পাঠ করেছেন। তারপর যখন উটনী চলতে শুরু করল এবং বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে গেল, তখন তিনি আবার তালবিয়া পাঠ করলেন। তাই যারা তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় তালবিয়া শুনে নাই, তারা মনে করল যে, তিনি প্রথম তালবিয়া সে সময়ই পড়েছেন, যখন বায়দা নামক স্থানে তিনি পৌঁছলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর এ বর্ণনা দ্বারা প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে

(١٦١) عَنْ خَلاَّدِبْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِيْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ اَوِ التَّلْبِيَةِ * (رواه مالك والترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى)

১৬১। খাল্লাদ ইবনে সায়েব তাবেয়ী তাঁর পিতা সায়েব ইবনে খাল্লাদ আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে জিব্‌রাঈল (আঃ) আসলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার সাথীদেরকে তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে বলি। —মালেক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

(١٦٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ اِلاَّ لَبّٰى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ مِنْ حَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا * (رواه الترمذى وابن ماجة)

১৬২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কোন মুসলমান বান্দা যখন হজ্জ অথবা উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার ডান ও বাম দিকে আল্লাহ্‌র যেসব মাখলূক থাকে, চাই সেগুলো নিষ্প্রাণ পাথর হোক অথবা বৃক্ষ কিংবা মাটির ঢিলা– সেগুলোও তার সাথে লাব্বাইক বলতে থাকে। এমনকি তা এ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত অতিক্রম করে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ বাস্তব সত্যটি কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও গুণকীর্তন করে থাকে; কিন্তু মানুষ এ তসবীহ্ ও প্রশংসা বুঝতে পারে না। ঠিক এভাবেই বুঝতে হবে যে, লাব্বাইক উচ্চারণকারী ঈমানদার বান্দার সাথে তার ডানে-বামের প্রতিটি জিনিস লাব্বাইক বলে। কিন্তু আমরা এদের লাব্বাইক ধ্বনি শুনতে পাই না।

তালবিয়ার পরের বিশেষ দো'আ

(١٦٣) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهٖ سَاَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهٗ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهٖ مِنَ النَّارِ * (رواه الشافعى)

১৬৩। ওমারা ইবনে খুযায়মা ইবনে সাবেত আনসারী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া থেকে ফারেগ হতেন, (অর্থাৎ, তালবিয়া পাঠ করে মুহ্‌রিম হয়ে যেতেন) তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের দো'আ করতেন এবং তাঁর অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা করতেন। —মুসনাদে শাফেয়ী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম তালবিয়ার পর এধরনের দো'আকে উত্তম ও সুন্নত বলেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রার্থনা করা হয় এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এ কথা স্পষ্ট যে, একজন মু'মিন বান্দার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ও তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামনা এটাই হতে পারে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করে নিবে, আর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের আযাব থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। এ জন্য এক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য দো'আ এটাই। তারপর এ দো'আ ছাড়া অন্য যে কোন দো'আও ইচ্ছা করলে করতে পারে। اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ

হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি কোন্ সালে এসেছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথাও লিখা হয়েছে যে, প্রবল মত এটাই যে, ৮ম হিজরীতে মক্কায় ইসলামী শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান এসেছে। ঐ বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তো হজ্জ পালন করেন নাই; কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠালেন এবং তারই নেতৃত্বে ঐ বছর হজ্জ আদায় হল। সেখানে আগামী দিনগুলোর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও দেওয়া হল, যেগুলোর মধ্যে একটি ঘোষণা এও ছিল যে, ভবিষ্যতে কোন মুশরিক ও কাফের হজ্জে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এবং জাহিলিয়্যাতের নোংরা ও মুশরিকসুলভ কোন কাজের অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না।

সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বছর হজ্জ না করার একটি বিশেষ হেকমত এও ছিল যে, তিনি চাইতেন যে, তাঁর হজ্জটি যেন এমন আদর্শ ও অনুকরণীয় হজ্জ হয়, যার মধ্যে কোন একজন মানুষও শিরক ও জাহিলিয়্যাতের রীতি-পদ্ধতি দ্বারা হজ্জকে কলুষিত না করে; বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল নূরই নূর ও কল্যাণই কল্যাণ থাকে এবং তাঁর দাওয়াত, হেদায়াত, শিক্ষা ও সংস্কারজনিত সুপ্রভাবের সঠিক দর্পণ হয়ে থাকে। এভাবে যেন ৯ম হিজরীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হজ্জটি পরবর্তী বছর অনুষ্ঠেয় তাঁর হজ্জের পটভূমি ও এর প্রস্তুতিরই একটি পদক্ষেপ ছিল।

তারপর পরবর্তী বছর- যা তাঁর জীবনের শেষ বছর ছিল- তিনি হজ্জের সংকল্প করলেন। আর যেহেতু তাঁকে এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে এখন আর অল্প দিনই তিনি অবস্থান করবেন এবং কাজের সুযোগ পাবেন, তাই তিনি নিজের এ ইচ্ছার (হজ্জের) কথা খুব গুরুত্ব সহকারে প্রচার করলেন। যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান এই মুবারক সফরে তাঁর সাথে থেকে হজ্জের বিধি-বিধান ও দ্বীনের অন্যান্য মাসায়েল শিখে নিতে পারে এবং হজ্জের সফরের সংসর্গ ও সান্নিধ্যের বিশেষ বরকত হাসিল করে নিতে পারে। ফলে দূর ও নিকটের হাজার হাজার মুসলমান- যারা এ সংবাদ শুনতে পেল এবং তাদের বিশেষ কোন অপারগতাও ছিল না,

তারা মদীনা তৈয়্যেবায় এসে হাজির হল। ২৪শে যিলকদ শুক্রবার ছিল। এদিন তিনি জুমু'আর খুত্বায় হজ্জ ও হজ্জের সফর সম্পর্কে বিশেষ দিকনির্দেশনা দিলেন এবং পরের দিন ২৫শে যিলকদ ১০ হিজরী শনিবার যোহরের নামাযের পর মদীনা শরীফ থেকে এ বিরাট কাফেলা রওয়ানা হল। আসরের নামায তিনি যুল হুলায়ফায় গিয়ে পড়লেন– যেখানে তিনি প্রথম মন্যিল করবেন এবং এখান থেকেই এহ্রাম বাঁধবেন। তিনি রাতও এখানেই কাটালেন এবং পরের দিন রোববার যোহরের নামাযের পর নিজে সাহাবায়ে কেরামসহ এহ্রাম বাঁধলেন এবং মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এভাবে ৯ম দিন অর্থাৎ, ৪ঠা যিলহজ্জ তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করলেন। সফরসঙ্গীদের সংখ্যা পথিমধ্যে আরও বাড়তেই থাকল।

এ সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যা নিয়ে রেওয়ায়াতে ভিন্নমত রয়েছে। চল্লিশ হাজার থেকে নিয়ে এক লাখ বিশ হাজার ও এক লাখ ত্রিশ হাজারের বর্ণনা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। এ অধমের নিকট এ মতবিরোধটি এমনই, যেমন, বিরাট সমাবেশ ও মেলায় যোগদানকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে মানুষের অনুমান আজও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই যিনি যে সংখ্যা বলেছেন, তার অনুমানের ভিত্তিতেই বলেছেন। একেবারে হিসাব করে ও গণনা করে কেউ এ সংখ্যা বলেননি। এতদসত্ত্বেও এতটুকু কথা সবগুলো বর্ণনায়ই রয়েছে যে, সমাবেশটি সীমা-সংখ্যার বাইরে ছিল, যেদিকেই দৃষ্টি যেত কেবল মানুষই মানুষ চোখে পড়ত।

এ হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়েছেন এবং ঠিক এভাবে; বরং পরিষ্কার এ কথা বলে দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন যে, এখন আমার প্রতিশ্রুত সময় ঘনিয়ে এসেছে, আর আমার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীনি শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ এর পর আর মিলবে না। যাহোক, এ সম্পূর্ণ সফরে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, উম্মতের পথ নির্দেশ ও উপদেশের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন।

বিদায় হজ্জ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়াত হাদীসগ্রন্থসমূহে রয়েছে, (যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি এখানেও লিখা হবে।) এগুলোর দ্বারা হজ্জের বিধি-বিধান ও এর বিস্তারিত নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া ছাড়া দ্বীন ও শরীঅতের অন্যান্য অধ্যায় ও শাখা-প্রশাখাসমূহের ব্যাপারেও উম্মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক বিষয় জানতে পারে। বাস্তব কথা এই যে, প্রায় এক মাসের এ সফরে দ্বীনের তালীম, তাবলীগ ও হেদায়াতের এত কাজ হয়েছে এবং এমন ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিসরে হয়েছে যে, এটা ছাড়া অনেক বছরেও তা হওয়া সম্ভব ছিল না। এ থেকেই উম্মতের কোন কোন ভাগ্যবান মনীষী এ কথা বুঝেছেন যে, দ্বীন ও দ্বীনের বরকত ও হেদায়াত লাভের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে দ্বীনি সফরে নেক লোকদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য।

এ ভূমিকার পর এবার বিদায় হজ্জ সম্পর্কে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর হাদীসটি মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কিন্তু হাদীসটি যেহেতু খুবই দীর্ঘ, এ জন্য পাঠকদের সুবিধার জন্য এর এক একটি অংশের তরজমা করে এর ব্যাখ্যা পেশ করা হবে।

(١٦٤) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى اَنْتَهٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهٖ اِلٰى رَاْسِىْ فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ

زِرِّىَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَابْنَ اَخِىْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِىْ نَسَّاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرْفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَائُهُ عَلٰى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَّاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهٖ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ بَصَرِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ مِثْلَ ذَالِكَ وَعَنْ يَسَارِهٖ مِثْلَ ذَالِكَ وَمِنْ خَلْفِهٖ مِثْلَ ذَالِكَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَاْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهٖ فَاَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهٖ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ *

১৬৪। জাফর ইবনে মুহাম্মদ (যিনি হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযিঃ-এর প্রপৌত্র ও ইমাম জাফর সাদেক নামে প্রসিদ্ধ।) নিজের পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী (ইমাম বাকের নামে যিনি সমধিক পরিচিত।) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা কয়েকজন সাথী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাদেরকে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন (এবং সবাই নিজেদের পরিচয় পেশ করল।) শেষে যখন আমার পালা আসল, তখন আমি বললাম, আমি হলাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন। (তিনি সে সময় খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আদর করে) তাঁর হাতটি আমার মাথার উপর রাখলেন। তারপর আমার জামার উপরের বোতামটি খুললেন এবং তারপর নিচের বোতামটিও খুলে ফেললেন। তারপর নিজের হাতটি (জামার ভিতরে নিয়ে) আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন যুবক ছিলাম। তিনি (আমার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে) বললেন, স্বাগতম! হে আমার ভাতিজা! তুমি আমার কাছে যা জিজ্ঞাসা করতে চাও নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পার। (ইমাম বাকের বলেন,) ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল, হযরত জাবের একটি ছোট চাদর গায়ে দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাদরটি এমন ছোট ছিল যে, তিনি যখন এটা কাঁদের উপর রাখতেন, তখন এর দু'প্রান্ত উপরে উঠে তার দিকে এসে যেত। অথচ তার

বড় চাদরটি তার নিকটেই আলনায় লটকানো ছিল। (কিন্তু তিনি এটা গায়ে দিয়ে নামায পড়া জরুরী মনে করলেন না; বরং ঐ ছোট চাদরটি গায়ে দিয়েই নামায পড়িয়ে দিলেন।) নামায শেষ করার পর আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত বলুন। তিনি হাতের আঙ্গুল দ্বারা ৯ সংখ্যার দিকে ইশারা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে ৯ বছর পর্যন্ত কোন হজ্জ পালন করেন নি। তার পর দশম হিজরীতে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এ বছর তিনি হজ্জ করবেন। এ ঘোষণা শুনে মদীনায় প্রচুর লোকের সমাগম হল। তাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হয়ে তাঁকে অনুসরণ করবে এবং তাঁর কাজের মতই কাজ করে যাবে। হযরত জাবের বলেন, আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম এবং যুল হুলায়ফায় এসে পৌঁছলাম। এখানে এসে আসমা বিনতে উমাইস (যিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের স্ত্রী ছিলেন এবং এ কাফেলায় শরীক ছিলেন।) মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরকে প্রসব করলেন। আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখন আমি কি করব? তিনি বললেন: এ অবস্থায়ই এহ্‌রামের জন্য গোসল করে নাও এবং এ অবস্থায় মহিলারা যেভাবে কাপড়ের লেঙ্গুট পরে থাকে, তুমিও তাই করে নাও, তারপর এহ্‌রাম বেঁধে নাও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলায়ফার মসজিদে নামায পড়লেন এরপর নিজের উটনী কাসওয়ায় সওয়ার হলেন। উটনী যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছল, তখন আমি ঐ উঁচু ভূমি থেকে চেয়ে দেখলাম যে, তাঁর ডানে, বায়ে, সামনে ও পেছনে আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আরোহী ও পদচারী লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হত, আর তিনিই এর প্রকৃত মর্ম ও দাবী জনাতেন। আর আমাদের রীতি এই ছিল যে, আমরা তাঁকে যা করতে দেখতাম, আমরা নিজেরাও তাই করতাম। (তাঁর উটনী যখন বায়দায় পৌঁছল, তখন) তিনি তওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া পাঠ করলেন:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

আর তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ যে তালবিয়া পড়ছিলেন (যার মধ্যে কিছু বাড়তি শব্দমালার সংযোজনও ছিল,) তিনি এর কোন প্রতিবাদ করেন নাই; বরং নিজে নিজের তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন, (মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবী তালবিয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা ও সম্মানসূচক কিছু শব্দমালা সংযোজন করতেন, আর যেহেতু এর অবকাশ রয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেননি; কিন্তু তিনি নিজের তালবিয়ার মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করেন নি।)

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِيْ اِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهٗ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلْثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ وَلَا اَعْلَمُهٗ ذَكَرَهٗ اِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَءُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى

الصَّفَا فَلَمَّا دَنٰى مِنَ الصَّفَا قَرَأَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقٰى عَلَيْهِ حَتّٰى رَاَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهٗ وَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشٰى اِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادٰى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهٗ فَقَالَ لَوْ اَنِّيْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَاسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهٗ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِاَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهٗ وَاحِدَةً فِى الْاُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ لَا بَلْ لِاَبَدٍ اَبَدٍ *

হযরত জাবের বলেন, এ সফরে আমাদের নিয়ত (মূলত) কেবল হজ্জেরই ছিল, উমরাকে আমরা (সফরের উদ্দেশ্য হিসাবে) জানতামই না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফ পৌঁছে গেলাম, তখন তিনি সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন। (অর্থাৎ, নিয়ম অনুযায়ী এর উপর হাত রেখে চুমু দিলেন এবং তারপর তওয়াফ শুরু করলেন।) এর তিন চক্করে তিনি রমল করলেন (অর্থাৎ, জোর কদমে চললেন,) আর বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। তারপর (তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে) তিনি মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থাৎ, মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা নামাযের স্থান বানাও। তারপর তিনি এভাবে দাঁড়ালেন যে, মাকামে ইব্রাহীম তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে ছিল এবং তিনি (তাওয়াফ পরবর্তী দু'রাকআত) নামায আদায় করলেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম জাফর সাদেক বলেন, আমার পিতা বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'রাকাআত নামাযে সূরা এখলাছ ও সূরা কাফিরূন পাঠ করলেন।

তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন এবং এতে চুম্বন করলেন। তারপর একটি দরওয়াজা দিয়ে (সায়ী করার জন্য) সাফা পর্বতের দিকে গেলেন। তিনি যখন সাফা পর্বতের একেবারে নিকটে পৌঁছলেন, তখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ("নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।") তারপর বললেন ঃ আমি এই সাফা থেকেই সায়ী শুরু করছি, যার উল্লেখ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে করেছেন। তারপর তিনি প্রথমে সাফার কাছে আসলেন এবং এর এতটুকু উপরে উঠলেন যে, বায়তুল্লাহ্ তিনি দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্র তওহীদ ও মহিমা ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ

اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ –

(আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব ও শাসন তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি [মক্কা ও সারা আরব ভূখণ্ডে শাসন ক্ষমতা দান ও নিজের দ্বীনকে বিজয়ী করার] প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন।) এ বাক্যগুলোই তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন এবং এগুলোর মাঝখানে দো'আ করলেন। তারপর সাফা থেকে অবতরণ করে দ্রুত মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন। যখন তাঁর পা মুবারক উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল, তখন তিনি কিছুটা দৌড়ে অগ্রসর হলেন। তারপর যখন সমতল স্থান থেকে উপরে এসে গেলেন, তখন নিজের স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলেন এবং এভাবে মারওয়া পর্বতে এসে গেলেন। এখানে তিনি সেরূপই করলেন, যেরূপ সাফায় করেছিলেন। এভাবে তিনি যখন শেষ চক্কর পূর্ণ করে মারওয়ায় পৌঁছলেন, তখন মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে সফরসঙ্গী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করলেন, আর তখন সফর সঙ্গীরা ছিল নীচে। তিনি বললেন ঃ আমি যদি আমার ব্যাপারে ঐ বিষয়টি আগে বুঝতে পারতাম, যা পরে বুঝেছি, তাহলে কুরবানীর পশু মদীনা থেকে আমার সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এ তাওয়াফ ও সায়ীকে আমি উমরার রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন এহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে উমরা বানিয়ে নেয়। এ কথা শুনে সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রাযিঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি কেবল আমাদের এ বছরের জন্য, না চিরকালের জন্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আপন হাতের অঙ্গুলীসমূহ একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন ঃ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ لاَبَلْ لِاَبَدٍ اَبَدٍ (উমরা কেবল হজ্জের মধ্যে প্রবেশই করল না; বরং তা চিরকালের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারওয়ায় সায়ী শেষ করে এই যে কথাটি বলেছিলেন, "যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসেনি, তারা যেন নিজেদের তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরা বানিয়ে নেয়। আর আমিও যদি কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে না আসতাম, তাহলে আমিও এমনই করতাম।" এর মর্ম ও স্বরূপ বুঝার আগে একথাটি জেনে নিতে হবে যে, জাহিলিয়্যাত যুগে হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে যেসব বিশ্বাসগত ও কর্মগত ভ্রান্তি প্রচলিত হয়ে অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, এগুলোর মধ্যে একটি ভ্রান্তি এও ছিল যে, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ যেগুলোকে হজ্জের মাস বলা হয়, (কেননা, হজ্জের সফর এ মাসগুলোতেই হয়ে থাকে।) এসব মাসে উমরা পালন করাকে কঠিন গুনাহ্ মনে করা হত। অথচ এ বিষয়টি ভুল ও মনগড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের শুরুতেই স্পষ্টভাবে লোকদেরকে এ কথা বলে দিয়েছিলেন যে, যার মন চায় সে কেবল হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধতে পারে, (যাকে পরিভাষায় এফরাদ বলা হয়।) আর যার মন চায় সে শুরুতে কেবল উমরার এহ্‌রাম বাঁধতে পারে এবং মক্কা শরীফ গিয়ে উমরা থেকে ফারেগ হয়ে হজ্জের জন্য আরেকটি

এহ্‌রাম বাঁধবে। (যাকে তামাত্তু বলা হয়।) আর যার মন চায় সে হজ্জ ও উমরার একই সঙ্গে এহ্‌রাম বাঁধবে এবং একই এহ্‌রামে উভয়টি আদায় করার নিয়ত করবে, (যাকে কেরান বলা হয়।)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শোনার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক লোকই নিজেদের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তামাত্তু হজ্জের ইচ্ছা করলেন এবং যুল হুলায়ফায় গিয়ে কেবল উমরার এহ্‌রাম বাঁধলেন। তাদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রাযিঃ) ছিলেন। অপর দিকে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম শুধু হজ্জের অথবা এক সাথে হজ্জ ও উমরার এহ্‌রাম বাঁধলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টির এহ্‌রাম বাঁধলেন, অর্থাৎ, কেরান পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাছাড়া নিজের কুরবানীর পশু (উট) ও তিনি মদীনা শরীফ থেকেই সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আর শরীঅতের বিধান হচ্ছে, যে হাজী কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে হজ্জ করতে যায়, সে ঐ পর্যন্ত এহ্‌রাম শেষ করতে পারে না, যে পর্যন্ত সে ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করে না নেয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐসব সাহাবায়ে কেরাম যারা তাঁর মতই কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারা হজ্জের পূর্বে (অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর আগে) এহ্‌রাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। কিন্তু যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসেননি, তাদের জন্য এ ধরনের কোন অপারগতা ছিল না।

মক্কা শরীফে পৌঁছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্রভাবে অনুভব করলেন যে, এই যে জাহিলিয়্যাত সুলভ একটি কথা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করা কঠিন গুনাহ– এর প্রতিবাদ ও মূলোৎপাটনের জন্য এবং মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে এর সূক্ষ্ম জীবাণু দূর করার জন্য এটা খুবই যরূরী যে, ব্যাপকভাবে এর বিপরীত কাজ করে দেখানো হোক। আর এর সম্ভাব্য পন্থা এটাই ছিল যে, তাঁর সাথীদের মধ্যে থেকে বেশী সংখ্যক লোক যারা তাঁর সাথে তাওয়াফ ও সায়ী করে নিয়েছিল, তারা এ তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরায় রূপান্তরিত করে এহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়ে আবার এহ্‌রাম বেঁধে নিবে। আর তিনি নিজে যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, এজন্য তাঁর বেলায় এর অবকাশ ও সুযোগ ছিল না। এজন্যই তিনি বললেন ঃ "যদি প্রথমেই আমি ঐ বিষয়টি অনুভব করতাম, যা পরে অনুভব করেছি, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং এই তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরা বানিয়ে দিয়ে এহ্‌রাম শেষ করে দিতাম। (কিন্তু আমি যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে আনার কারণে এমন করতে অপারগ, তাই তোমাদেরকে বলছি যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি, তারা যেন এই তাওয়াফ ও সায়ীকে উমরা বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের এহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যায়।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শুনে সুরাকা ইবনে মালেক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি যেহেতু এখন পর্যন্ত এ কথাই জানতেন যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করা কঠিন গুনাহ, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ দিনগুলোতে পৃথক উমরা করার এ বিধান কি কেবল এ বছরের জন্য, না এখন থেকে সবসময়ই হজ্জের মাসগুলোতে এমন করা যাবে?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালভাবে বুঝানোর জন্য নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন ঃ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ হজ্জের মধ্যে উমরা এভাবে দাখিল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, হজ্জের মাসগুলোতে এবং হজ্জের একেবারে নিকটবর্তী দিনগুলোতেও উমরা করা যায়। এটাকে গুনাহ্ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও জাহেলী বিশ্বাস, আর এ বিধানটি সব সময়ের জন্য।

وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَانْكَرَ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ اَمَرَنِىْ بِهٰذَا) فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهٖ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهٗ هَدْىٌ*

হযরত আলী (রাযিঃ) (যিনি যাকাত আদায় ইত্যাদির জন্য ইয়ামান গিয়েছিলেন।) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর জন্য আরও বাড়তি কিছু পশু নিয়ে মক্কায় আসলেন। তিনি এসে তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে দেখলেন যে, তিনি এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছেন, রঙ্গীন কাপড় পরিধান করে নিয়েছেন এবং সুরমাও ব্যবহার করে ফেলেছেন। তিনি তার এ কাজকে খুব ভুল মনে করলেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। (আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এমন করতে কে বলেছে?) হযরত ফাতেমা বললেন, আমাকে আব্বাজান (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইরূপ করতে বলেছেন। (তাই আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি।) তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যখন তালবিয়া পড়ে এহ্রাম বেঁধেছিলে তখন কি বলেছিলে? (অর্থাৎ, এফরাদের নিয়মে শুধু হজ্জের নিয়ত করেছিলে, না তামাত্তুর নিয়মে কেবল উমরার নিয়ত করেছিলে, না কেরানের নিয়মে এক সাথে উভয়টির নিয়ত করেছিলে?) তিনি উত্তর দিলেন, আমি এভাবে নিয়ত করেছিলাম ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ (হে আল্লাহ্! আমি ঐ জিনিসের এহ্রাম বাঁধছি, যে জিনিসের এহ্রাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেহেতু কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি, (আর এ কারণে হজ্জের আগে আমি এহ্রাম খুলতে পারব না, আর তুমি আমার মতই এহ্রামের নিয়ত করেছ,) তাই তুমিও আমার মতই এহ্রাম অবস্থায় থাক। হযরত জাবের বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) ইয়ামান থেকে কুরবানীর যেসব পশু নিয়ে এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে (মদীনা থেকে) যা নিয়ে এসেছিলেন, এগুলোর মোট সংখ্যা ছিল একশ। (কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ৬৩টি উট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে এনেছিলেন, আর ৩৭টি হযরত আলী ইয়ামান থেকে এনেছিলেন। হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতে ঐসকল সাহাবায়ে কেরাম— যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে

আসেননি, তারা সবাই [সাফা-মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথার চুল কেটে] হালাল হয়ে গেলেন।) কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐসব সাহাবীগণ এহ্রাম অবস্থায় থেকে গেলেন, যারা কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ যেসব সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মোতাবেক এহ্রাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন, তারা এ ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করেননি; বরং কেবল ছেঁটে নিয়েছিলেন। এরূপ তারা সম্ভবত এ কারণে করেছিলেন, যাতে মাথা মুন্ডানোর ফযীলতটি হজ্জের এহ্রাম খোলার সময় লাভ করতে পারেন।

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنًى فَاَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاتَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلَّا اَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا –

তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) আসল, তখন সবাই মিনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। (আর যারা উমরা করে হালাল হয়ে গিয়েছিল,) তারা হজ্জের এহ্রাম বাঁধল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর সওয়ার হয়ে মিনায় পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি (এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে খাইফে) যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর আরও কিছু সময় তিনি মিনায় অবস্থান করলেন এবং এখানেই সূর্যোদয় হয়ে গেল। এ সময় তিনি (আরাফার) নামিরায় তাঁর জন্য একটি পশমের তাবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, কুরাইশদের ধারণা ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন, যেমন, জাহিলিয়্যাত যুগে কুরাইশরা এমনই করত। (কিন্তু তিনি এমন করলেন না); বরং মাশ'আরুল হারামের সীমানা অতিক্রম করে আরাফায় পৌঁছে গেলেন এবং দেখলেন যে, নির্দেশমত নামিরায় তাঁর জন্য তাবু খাটানো হয়ে গিয়েছে। অতএব, তিনি সেখানে অবতরণ করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জের বিশেষ কার্যক্রম ৮ই যিলহজ্জ থেকে শুরু হয়— যাকে "তারবিয়ার দিন" বলা হয়। এ দিন প্রভাতে হাজী সাহেবান মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এফরাদ অথবা কেরানকারীগণ তো আগে থেকেই এহ্রাম অবস্থায় থাকেন। তাদের ছাড়া অন্য হাজীগণ এ দিনই অর্থাৎ, ৮ই যিলহজ্জ এহ্রাম বেঁধে মিনার দিকে যান এবং ৯ই যিলহজ্জ সকাল পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে কিছু সাহাবায়ে কেরাম– যারা নিজেদের কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারা তো এহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। অবশিষ্ট সাহাবীগণ— যারা উমরা আদায় করে এহ্রাম খুলে নিয়েছিলেন, তারা সবাই ৮ তারিখের সকালে হজ্জের এহ্রাম বাঁধলেন এবং হজ্জের এ কাফেলা মিনা রওয়ানা হয়ে গেল এবং এ দিন

তারা সেখানেই অবস্থান করলেন। তারপর ৯ তারিখ সকালে সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিকে যাত্রা শুরু হল। আরাফা মিনা থেকে প্রায় ৬ মাইল এবং মক্কা শরীফ থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এটা হরমের সীমানার বাইরে; বরং এ দিকে হরমের সীমানা যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই আরাফার এলাকা শুরু হয়।

আরবের সাধারণ গোত্রসমূহ— যারা হজ্জের জন্য আসত, তারা সবাই ৯ই যিলহজ্জ হরমের সীমানা থেকে বাইরে গিয়ে আরাফায় অবস্থান গ্রহণ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোত্রের লোকেরা অর্থাৎ, কুরাইশগণ— যারা নিজেদেরকে কাবার প্রতিবেশী ও মুতাওয়াল্লী এবং আল্লাহ্র হরমের অধিবাসী বলত, তারা ওকূফের জন্যও হরমের বাইরে যেত না; বরং এর সীমানার ভিতরেই মুযদালিফা অঞ্চলের মাশ'আরুল হারাম পর্বতের কাছে অবস্থান করত এবং এটাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য মনে করত। নিজেদের এ গোত্রীয় সনাতন প্রথার কারণে কুরাইশদের এ বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাশ'আরুল হারামের নিকটই অবস্থান করবেন। কিন্তু যেহেতু তাদের এ রীতিটি ভুল ছিল এবং ওকূফের সঠিক স্থান আরাফাই ছিল, এজন্য তিনি মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ই লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমার জন্য নামিরায় যেন তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়। এ নির্দেশের ভিত্তিতেই নামিরা উপত্যকায়ই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁবু খাটানো হয়। তিনি সেখানে গিয়েই অবতরণ করেন এবং ঐ তাঁবুতেই অবস্থান গ্রহণ করেন।

حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهٗ فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلَا كُلُّ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَهٗ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَّ اَوَّلُ رِبًا اَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ وَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ فَاِنْ فَعَلْنَ ذَالِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تُسْئَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا —

অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি নিজের উটনী কাসওয়ার উপর হাওদা স্থাপনের নির্দেশ দিলেন এবং নির্দেশমত তা করা হল। তিনি এর উপর সওয়ার হয়ে ওয়াদীয়ে উরনার

মাঝে আসলেন এবং উটনীর পিঠে বসা অবস্থায়ই লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমাদের একের জান-মাল অন্যের উপর হারাম। (অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও অবৈধভাবে কারও সম্পদ গ্রাস করা তোমাদের জন্য সব সময়ই হারাম।) ঠিক সেভাবে, যেভাবে আজ এ আরাফার দিনে, যিলহজ্জের এ মুবারক মাসে ও তোমাদের এ পবিত্র নগরী মক্কায় (তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও তার সম্পদ গ্রাস করাকে হারাম মনে করে থাক)। শুনে রাখ, মূর্খতার যুগের সকল অপকর্ম আমার পায়ের নীচে দাফন করে দিলাম। (আমি এগুলোর সমাপ্তি ও রহিতকরণের ঘোষণা দিচ্ছি।) জাহিলিয়্যাত যুগের রক্তের দাবীও রহিত করা হল। (অর্থাৎ, জাহিলিয়্যত যুগের কোন রক্তের দাবী আর কোন মুসলমান করবে না।) আর সর্বপ্রথম আমি আমাদের একটি রক্তের দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে রবী'আ ইবনুল হারেছের পুত্রের রক্তের দাবী। সে বনূ সা'দ গোত্রে দুগ্ধপান অবস্থায় ছিল, তাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করে ফেলেছিল। (হুযাইল গোত্র থেকে এ রক্তের বদলা নেওয়া বাকী ছিল। কিন্তু আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন এ ব্যাপার শেষ, কোন বদলা নেওয়া হবে না।) জাহিলিয়্যাত যুগের সকল সুদের দাবী রহিত করা হল। (এখন আর কোন মুসলমান কারও কাছে নিজের সুদের দাবী করতে পারবে না।) আর এ ক্ষেত্রেও আমি সর্বপ্রথম আমার খান্দানের সুদের দাবী থেকে আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেবের সুদের দাবী রহিত ঘোষণা করছি। তার সকল সুদের দাবী আজ শেষ করে দেওয়া হল। তোমরা নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্কের বিষয়টি আল্লাহ্র বিধানে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের বিশেষ হক হচ্ছে এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কাউকে যেতে না দেয়, যার আগমন তোমরা অপছন্দ কর। কিন্তু তারা যদি এমন করে ফেলে, তাহলে তোমরা (তাদেরকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার জন্য) কিছুটা হাল্কা শাস্তি দিতে পার। আর তোমাদের উপর তাদের বিশেষ অধিকার ও দাবী হচ্ছে এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিবে। আমি তোমাদের কাছে এমন হেদায়াতের উপকরণ রেখে যাচ্ছি যে, এটা শক্তভাবে ধরে থাকলে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে (যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম ও তাঁর বিধান পৌঁছে দিয়েছি কি-না।) তাই বল, তোমরা সেখানে কি বলবে? উপস্থিত সবাই বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং কেয়ামতের দিনও সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন। এরপর তিনি নিজের শাহাদত অঙ্গুলী আসমানের দিকে উঠিয়ে এবং উপস্থিত লোকদের দিকে এর দ্বারা ইশারা করে তিনবার বললেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক যে, আমি তোমার পয়গাম তোমার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি, তোমার এ বান্দারা একথা স্বীকার করছে। তারপর বিলাল (রাযিঃ) আযান দিলেন, তারপর একামত বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। তারপর বিলাল একামত বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন।

ব্যাখ্যা ঃ এটা জানা কথা যে, ঐ দিনটি অর্থাৎ, ঐ বছরের ওকূফে আরাফার দিনটি শুক্রবার ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন সূর্য ঢলার পর প্রথমে পূর্বে উল্লেখিত খুত্বা প্রদান করলেন। তারপর যোহর ও আসরের উভয় নামায যোহরের ওয়াক্তে একই সাথে পড়লেন। হাদীসে স্পষ্টভাবে যোহরের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি ঐ দিন জুমু'আর নামায পড়েননি; বরং এর স্থলে যোহর পড়েছেন। আর তিনি যে খুতবা দিয়েছিলেন এটা জুমু'আর ছিল না; বরং আরাফা দিবসের খুতবা ছিল। সেখানে জুমু'আ না পড়ার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, আরাফা কোন জনবসতি নয়; বরং একটি মরুপ্রান্তর। আর জুমু'আ জনবসতিতে পড়া হয়। والله اعلم

আরাফার দিনের এ খুত্বায় তিনি যেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, ঐ সময়ে ও ঐ সমাবেশে এসব জিনিসেরই ঘোষণা ও প্রচার সবচেয়ে যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খুত্বার পর তিনি যোহর ও আসরের নামায একসাথে যোহরের ওয়াক্তেই আদায় করেছেন এবং মাঝে কোন সুন্নত অথবা নফলের দু'রাকআতও আদায় করেননি। উম্মত এ কথায় একমত যে, ওকূফে আরাফার এ দিনে এ দু'টি নামায এভাবেই পড়তে হবে। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশার নামাযও এ দিন মুযদালিফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্তে এক সাথে পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছিলেন– যেমন সামনে গিয়ে জানা যাবে। ঐ দিন এ নামাযগুলোর সঠিক নিয়ম ও সঠিক সময় এটাই। এর একটি রহস্যপূর্ণ কারণ তো এই হতে পারে যে, ঐ দিনটির এ বৈশিষ্ট্য সবার সামনে যেন ফুটে উঠে যে, আজকের এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নামাযের ওয়াক্তগুলোতেও এ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এটাও হতে পারে যে, এ দিনের মূল ওযীফা ও কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির ও দো'আ। তাই আল্লাহ্র বান্দারা যাতে একাগ্রচিত্তে এতে লিপ্ত থাকতে পারে এবং যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত; বরং এশা পর্যন্ত যেন কোন নামাযের চিন্তাও করতে না হয়, এজন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনের এ খুত্বায়— যাকে নিজের ক্ষেত্র ও স্থান বিবেচনায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুত্বা ও ভাষণ বলা যায়— তিনি নিজের ওফাত ও বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্তী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে শেষ কথাটি এই বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য হেদায়াত ও আলোর ঐ পরিপূর্ণ উপকরণ রেখে যাচ্ছি, যার পর তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না— যদি তোমরা একে আঁকড়ে থাক এবং এর আলোতে পথ চল। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব কুরআন মজীদ।" এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃত্যুশয্যার শেষ দিনগুলোতে যখন প্রচণ্ড রোগের কারণে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, এ সময় ওসিয়ত হিসাবে তিনি যে কিছু লেখাতে চেয়েছিলেন এবং যার ব্যাপারে বলেছিলেন ঃ "তোমরা এরপর বিপথগামী হবে না", তিনি এতে কি লেখাতে চেয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের এ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে থাকার ও এর অনুসরণ করার ওসিয়ত লিখাতে চেয়েছিলেন। তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণেও বলে দিয়েছিলেন যে, এ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব কুরআন শরীফের। আর যেহেতু হযরত ওমর (রাযিঃ) এ বাস্তব কথাটি জানতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষেত্রমত কথা বলার সাহসও দান করেছিলেন, এজন্য তিনি এ ক্ষেত্রে এ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সারা

জীবনের শিক্ষা দ্বারা আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে যে, এ মর্যাদা আল্লাহ্র কিতাবেরই। তাই এ কঠিন অবস্থায় ওসিয়ত লেখা ও লেখানোর বিষয়টির তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَدَفَعَ حَتَّى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَ اِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى اَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتَّى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلْثًا وَّ سِتِّيْنَ بُدْنَةً بِيَدِهٖ ثُمَّ اَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى عَلٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ * (رواه مسلم)

তারপর তিনি (যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করে) নিজের উটনীর উপর সওয়ার হয়ে আরাফার ময়দানের ওকূফস্থলে আসলেন। এখানে তিনি নিজের উটনীর রুখ ঐদিকে করে দিলেন, যে দিকে পাথরের বিরাট বিরাট প্রান্তর রয়েছে, আর পদচারী জনতাকে তিনি নিজের সামনে করে নিলেন এবং নিজে কেবলামুখী হয়ে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন— যেপর্যন্ত না সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল এবং (সন্ধ্যার শেষ সময়ে আকাশ যে পিতবর্ণ ধারণ করে, ঐ) পিতাভ বর্ণও শেষ হয়ে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে চলে গেলে তিনি (আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলেন এবং উসামা ইবনে যায়েদকে নিজের উটনীর পেছনে বসালেন। এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একসাথে এক আযান ও দুই একামতে পড়লেন। (অর্থাৎ, আযান একবারই দেওয়া হল; কিন্তু একামত মাগরিবের জন্য পৃথক দেওয়া হল এবং এশার জন্যও পৃথক দেওয়া হল।) আর এ দু'নামাযের মাঝে তিনি কোন সুন্নত ও নফল পড়লেন না। তারপর তিনি শুয়ে গেলেন এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুয়েই থাকলেন। সুবহে

সাদেক হতেই তিনি আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর মাশ'আরুল হারামের কাছে আসলেন। (অধিক সমর্থিত মত অনুযায়ী এটা একটা টিলা ছিল— মুযদালিফার সীমার মধ্যে। এখনও এ অবস্থাই রয়েছে এবং সেখানে চিহ্ন হিসাবে একটি ইমারত তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।) এখানে এসে তিনি কেবলা অভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করলেন। তিনি আকাশ খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। তারপর সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে তিনি মিনার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে রওয়ানা দিলেন এবং ফয্ল ইবনে আব্বাসকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে তিনি যখন "বতনে মুহাস্সারে" পৌঁছলেন, তখন নিজের উটনীর চলার গতি কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর এখান থেকে বের হয়ে তিনি ঐ মাঝের পথ ধরলেন, যা বড় জামরার নিকট গিয়ে পৌঁছে। তারপর ঐ জামরার নিকট পৌছে— যা গাছের সন্নিকটে— সাতটি কংকর মারলেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বললেন। কংকরগুলো ছিল মটর দানার মত। আর তিনি এগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন বত্নে ওয়াদী (অর্থাৎ, জামরার নিকটবর্তী নীচু ভূমি) থেকে। কংকর মারা শেষ করে তিনি কুরবানীস্থলে আসলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। বাকীগুলো হযরত আলীর হাওয়ালা করলেন এবং এগুলো হযরত আলীই কুরবানী করলেন। তিনি নিজের কুরবানীর পশুতে হযরত আলীকেও শরীক রাখলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন, যেন প্রতিটি কুরবানীর পশু থেকে এক একটি টুকরা নেওয়া হয় এবং একত্রে পাক করা হয়। সেমতে একটি বড় ডেকে এটা রান্না করা হল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী এগুলোর গোশ্ত আহার করলেন এবং শুরবাও পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র দিকে রওয়ানা করলেন এবং যোহরের নামায মক্কায় গিয়ে পড়লেন। নামায শেষে তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছলেন, যারা যমযমের পানি উঠিয়ে লোকদেরকে পান করাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি টান, আমার যদি এ আশংকা না হত যে, অন্য লোকেরা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে তোমাদের এ খেদমত ছিনিয়ে নিবে, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। এ সময় তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল, আর তিনি সেখান থেকে কিছু পান করে নিলেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জের সবচেয়ে বড় কাজ ও রুকন হচ্ছে ওকূফে আরাফা। অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহর ও আসরের নামায একসাথে আদায় করে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থানকে কত দীর্ঘ করেছিলেন। যোহর ও আসরের নামায তিনি যোহরের শুরু ওয়াক্তেই পড়ে নিয়েছিলেন এবং এ সময় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি ওকূফ করেছিলেন। তারপর সোজা মুযদালিফায় রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পৌঁছে এক সাথে আদায় করলেন। আর উপরে বলা হয়েছে যে, এটাই হচ্ছে এ দিনের জন্য আল্লাহ্র হুকুম।

মুযদালিফার এ রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায শেষ করে ফজর পর্যন্ত আরাম করলেন এবং এ রাতে তাহাজ্জুদের নামায দু'রাকআতও পড়লেন না। (অথচ

তাহাজ্জুদের নামায তিনি সফরের অবস্থাতেও বাদ দিতেন না।) এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ৯ই যিলহজ্জের সারাটি দিন তিনি খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন। সকালে মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে আরাফায় পৌঁছলেন এবং সেখানে প্রথম ভাষণ দিলেন। তারপর যোহর ও আসরের নামায পড়লেন এবং এরপর থেকে মাগরিব পর্যন্ত একাধারে ওকূফ করলেন। তারপর এ সময়েই আরাফা থেকে মুযদালিফার পথ অতিক্রম করলেন। মনে হয়, তিনি যেন ফজর থেকে নিয়ে এশা পর্যন্ত একাধারে বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা ও পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তা'ছাড়া পরের দিন অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জও তাঁকে এমন কর্মব্যস্ত দিন কাটাতে হবে। অর্থাৎ, সকালে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে মিনা পৌঁছা, সেখানে গিয়ে প্রথমে শয়তানকে পাথর মারা, তারপর একটি-দু'টি অথবা দশ-বিশটি নয়; বরং ষাটের অধিক উট নিজ হাতে কুরবানী করা, তারপর তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মিনা থেকে মক্কা যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার মিনায় ফিরে আসা। তাই দেখা গেল যে, যেহেতু ৯ই ও ১০ই যিলহজ্জের এ দু'টি দিন খুবই কর্মব্যস্ততার ও পরিশ্রমের দিন ছিল, এজন্য এ দু'দিনের মাঝের রাতটিতে (অর্থাৎ, মুযদালিফার রাতে) পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা যরূরী ছিল। দেহ ও দৈহিক শক্তিগুলোরও কিছু দাবী ও হক থাকে এবং এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এ ধরনের সমাবেশগুলোতে বেশী যরূরী হয়— যাতে সাধারণ মানুষ ইসলামের সহজীকরণের নীতি এবং বিশেষ অবস্থায় রেয়ায়াতের রীতিটি বুঝে নিতে পারে। والله اعلم

এ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করে ছিলেন। এগুলো খুব সম্ভব ঐ তেষট্টিটিই, যেগুলো তিনি মদীনা শরীফ থেকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বাকী সাঁইত্রিশটি যা হযরত আলী ইয়ামান থেকে এনেছিলেন, এগুলো তিনি তার হাতেই কুরবানী করালেন। তেষট্টি সংখ্যাটির হেকমত একেবারে স্পষ্ট যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তেষট্টি বছর ছিল। তাই তিনি যেন জীবনের প্রতিটি বছরের শুকরিয়া হিসাবে একটি করে উট কুরবানী করলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আলী (রাযিঃ) নিজের কুরবানীর উটের গোশ্‌ত রান্না করে খেয়েছেন এবং শুরবাও পান করেছেন। এর দ্বারা সবার একথা জানা হয়ে গেল যে, কুরবানীদাতা নিজের কুরবানীর গোশ্‌ত নিজেও খেতে পারে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে পারে।

১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর কাজ শেষ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফ তশরীফ নিয়ে গেলেন। সুন্নত নিয়ম ও উত্তম এটাই যে, তওয়াফে যিয়ারত কুরবানী থেকে অবসর হয়ে ১০ই যিলহজ্জেই করে নেওয়া হবে— যদিও বিলম্বেরও অবকাশ রয়েছে।

যমযমের পানি উঠিয়ে হাজীদেরকে পান করানো-এ খেদমত ও সৌভাগ্যের কাজটি প্রাচীনকাল থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খান্দান বনী আব্দুল মুত্তালিবের ভাগে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে যমযমের কাছে আসলেন। সে সময় তাঁর খান্দানের লোকেরা বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে উঠিয়ে লোকদেরকে পান করাচ্ছিল। তাঁর মনেও এ কাজে অংশ গ্রহণ করার বাসনা জাগ্রত হল। কিন্তু তিনি একেবারে সঠিক চিন্তা করলেন যে, আমি যদি এমন করি, তাহলে আমার অনুসরণ ও অনুকরণ

করতে গিয়ে সকল সাথীরাই এ সৌভাগ্যে অংশ গ্রহণ করতে চাইবে। এর ফলে বনী আব্দুল মুত্তালিব তাদের দীর্ঘকালের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এজন্য তিনি নিজের বংশের লোকদের মন রক্ষা করার জন্য এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য অন্তরের আকাঙ্ক্ষা তো প্রকাশ করলেন, কিন্তু সাথে সাথে ঐ পরিণামদর্শিতার কথাটিও বলে দিলেন, যার কারণে তিনি নিজের এ আন্তরিক বাসনা বিসর্জন দিয়েছিলেন।

শুরুতে যেমন বলে আসা হয়েছে যে, হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি বিদায় হজ্জের বর্ণনায় সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবিস্তার বর্ণনা সমৃদ্ধ হাদীস। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেক ঘটনার উল্লেখ এতে বাদ পড়ে গিয়েছে। এমনকি মাথা মুড়ানো এবং দশ তারিখের খুত্বার উল্লেখও এতে আসেনি, যা অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর এ হাদীসের কোন কোন রাবী এ হাদীসেই এ অতিরিক্ত বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ ঘোষণাও করেছিলেন ঃ

نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنٰى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ – رواه مسلم

অর্থাৎ, আমি কুরবানী এখানে করেছি; কিন্তু মিনার সমস্ত এলাকাই কুরবানীস্থল। তাই তোমরা নিজ নিজ জায়গায় কুরবানী করতে পার। আমি আরাফায় এখানে (বড় বড় পাথরের প্রান্তরে) ওকূফ করেছি; কিন্তু সমস্ত আরাফার ময়দানই ওকূফস্থল। (তাই এর যে কোন অংশেই ওকূফ করা যায়।) আমি মুযদালিফায় এখানে (মাশ'আরুল হারামের নিকটে) অবস্থান করেছি; কিন্তু সারা মুযদালিফাই ওকূফ তথা অবস্থানস্থল। (এর যে কোন অংশেই অবস্থান করা যায়।)

(١٦٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِيْ حَجَّتِهِ * (رواه مسلم)

১৬৫। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ্জে আপন বিবিদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন। —মুসলিম

(١٦٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَاَجِلَّتِهَا وَاَنْ لاَ اُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا * (رواه البخارى ومسلم)

১৬৬। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তাঁর কুরবানীর উটসমূহ দেখাশুনা করি এবং এগুলোর গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি গরীবদের মধ্যে সদাকা করে দেই। আর কসাইকে যেন (পারিশ্রমিক হিসাবে) এখান থেকে কিছু না দেই। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তাদের পারিশ্রমিক নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিব। —বুখারী, মুসলিম

(١٦٧) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مِنًى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ *

(رواه البخاری ومسلم)

১৬৭। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১০ই যিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে) মিনায় আসলেন। এখানে এসে তিনি প্রথমে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারলেন। তারপর নিজের তাঁবুতে আসলেন এবং কুরবানীর পশুগুলো যবাহ্ করলেন। তারপর তিনি নাপিতকে ডাকলেন এবং প্রথমে মাথার ডান দিক তার সামনে ধরে দিলেন। নাপিত এ দিকের চুল মুড়িয়ে নিল। তিনি আবূ তালহা আনসারীকে চুলগুলো দিলেন। তারপর মাথার বাম দিক নাপিতের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এখন এগুলো মুড়িয়ে নাও। সে এ দিকটাও মুড়িয়ে নিলে তিনি আবূ তালহাকে এ চুলগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর উপরের দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মুড়ানোর এ ঘটনাটি আলোচনা থেকে ছুটে গিয়েছে। অথচ এটা হজ্জের ধারাবাহিক কার্যসমূহের মধ্যে দশই যিলহজ্জের একটি বিশেষ আমল ও এবাদত। এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা গেল যে, মাথা মুড়ানোর সঠিক পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ডান দিকের চুল পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হবে, তারপর বাম দিকের।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে নিজের কেশ মুবারক আবূ তালহা আনসারী (রাযিঃ)-কে দিয়েছিলেন। আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ও তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি শত্রুদের নিক্ষেপিত তীর নিজের শরীর পেতে গ্রহণ করতেন। এতে তার দেহে চালুনির মত অসংখ্য ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবা ও আরামের প্রতি এবং তাঁর কাছে আগত মেহমান-মুসাফিরদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। মোটকথা, এ ধরনের সেবাকার্যে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মা)-এর একটা বিশেষ অবস্থান ছিল। সম্ভবত এসব বিশেষ খেদমত ও সেবার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথার কেশ মুবারক তাকে দিয়েছিলেন এবং অন্যদের মাঝেও তার মাধ্যমে বিতরণ করেছিলেন। এ হাদীসটি আল্লাহ্ওয়ালা ও পুণ্যবানদের তাবাররুক গ্রহণ করার বৈধতারও স্পষ্ট ভিত্তি ও দলীল।

অনেক স্থানে যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর "কেশ মুবারক" রয়েছে বলে বলা হয়, এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোর বেলায় নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে, প্রবল ধারণা এটাই যে, এগুলো বিদায় হজ্জের সময় বিতরণকৃত ঐসব চুলেরই অংশ হবে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আবূ তালহা লোকদেরকে একটি একটি

অথবা দু'টি দু'টি করে চুল বিলিয়েছিলেন। এভাবে এ চুলগুলো হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর এ কথাও স্পষ্ট যে, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পবিত্র তাবাররুকের হেফাযত করে থাকবে। এজন্য এগুলোর মধ্য থেকে অনেকগুলোই যদি এ পর্যন্তও কোথাও কোথাও সংরক্ষিত থেকে থাকে, তাহলে এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সনদ ছাড়া কোন চুলকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর "কেশ মুবারক" সাব্যস্ত করা খুবই মারাত্মক কথা ও বিরাট গুনাহ্। আর সর্বাবস্থায় অর্থাৎ, আসল হোক অথবা কৃত্রিম– এটাকে এবং এর প্রদর্শনীকে ব্যবসার মাধ্যম বানিয়ে নেওয়া— যেমন, অনেক স্থানে হয়ে থাকে— জঘন্য অপরাধ।

(١٦٨)عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর তাদের প্রতি, যারা মাথা মুন্ডন করে নিয়েছে। উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করলেন, যারা চুল ছেঁটে নিয়েছে তাদের জন্যও দো'আ করুন। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর তাদের প্রতি, যারা মাথা মুন্ডন করে নিয়েছে। তারা আবার আরয করল, যারা চুল ছেঁটে নিয়েছে তাদের জন্যও এ দো'আ করুন। তৃতীয়বার তিনি বললেন ঃ তাদের প্রতিও যারা চুল ছেঁটে নিয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অভ্যাস অথবা প্রয়োজন হিসাবে মাথা মুন্ডন করা অথবা ছেঁটে নেওয়া কোন এবাদত নয়; কিন্তু হজ্জ ও উমরার মধ্যে যে মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছেঁটে নেওয়া হয়, এর মাধ্যমে বান্দার পক্ষ থেকে তার গোলামী ও দীনতা-হীনতার প্রকাশ ঘটে; এজন্য এটা বিশেষ এবাদত, আর এ নিয়তেই মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছাঁটা চাই। আর যেহেতু গোলামীর ও বিনয়ের প্রকাশ মাথা মুন্ডনের দ্বারা বেশী প্রকাশ পায়, এজন্য এটাই উত্তম। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের দো'আর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(١٦٩) عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اِثْنَى عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُوا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ وَقَالَ اَيُّ شَهْرٍ هٰذَا فَقُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى

قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৬৯। হযরত আবূ বাকরা সাকাফী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) ১০ই যিলহজ্জ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি বললেন ঃ বছর ঘুরেফিরে তার ঐ অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় ছিল। বছর বার মাসেই হয়, এগুলোর মধ্যে চারটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত। তিনটি মাস একাধারে ঃ যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। আর চতুর্থটি হচ্ছে ঐ রজব মাস, যা জ ুমাদাল উখরা ও শা'বানের মাঝে থাকে এবং মুযার গোত্রের লোকেরা যার অধিক সম্মান করে থাকে।

তারপর তিনি বললেন ঃ বল তো, এটা কোন্ মাস ? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম দিয়ে দেবেন। এবার তিনি বললেন, এটা কি যিলহজ্জ মাস নয় ? আমরা আরয করলাম, নিঃসন্দেহে এটা যিলহজ্জ মাস। তারপর বললেন, তোমরা বল তো এটা কোন্ শহর ? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জ ানেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, তিনি এর অন্য কোন নাম দিয়ে দেবেন। তিনি তখন বললেন, এটা কি বালদাহ (মক্কা শহর) নয় ? আমরা আরয করলাম, হ্যাঁ, তাই। তারপর বললেন ঃ বল তো, এটা কোন্ দিন ? আমরা উত্তর দিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এসময় তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এর অন্য কোন নাম দিয়ে দেবেন। তিনি তখন বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা আরয করলাম, হ্যাঁ, আজ কুরবানীর দিন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের উপর হারাম, (অর্থাৎ, তোমাদের কারও জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে অথবা কারও সম্পদ ও সম্ভ্রমের উপর হস্তক্ষেপ করবে। এগুলো তোমাদের উপর সবসময়ের জন্যই হারাম।) যেমন আজকের এ দিনে, এ পবিত্র শহরে ও এ পবিত্র মাসে কাউকে হত্যা করা ও তার সম্পদ ও সম্ভ্রমহানি করা তোমরা হারাম মনে করে থাক। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে এবং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান! তোমরা আমার পর বিপথগামী হয়ে গিয়ে একে অন্যের জীবননাশ করতে যেয়ো না। (তারপর বললেন ঃ) আমি কি আল্লাহ্র পয়গাম তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি ? উপস্থিত সবাই বললেন, হ্যাঁ, আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর

তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। (তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ) যারা এখানে উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে আমার কথা পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাকে পরে পৌঁছানো হয়, সে আসল শ্রোতা থেকেও অধিক উপলব্ধিকারী ও সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে (এবং সে এলমের আমানতের হক বেশী আদায় করে।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ভাষণের শুরু অংশে যমানা ও বছরের ঘুরেফিরে তার প্রাথমিক ও আসল অবস্থানে ফিরে আসার যে কথা বলা হয়েছে, এর অর্থ ও মর্ম বুঝার জন্য একথাটি জেনে নেওয়া যরূরী যে, জাহিলিয়্যাত যুগে আরববাসীদের একটি ভ্রান্ত নীতি এও ছিল যে, তারা নিজেদের বিশেষ স্বার্থে কখনো কখনো বছর তের মাসের বানিয়ে নিত এবং এর জন্য একটি মাসকে দু'বার গণনা করত। এর অনিবার্য ফল এই ছিল যে, মাসের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবতার বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য হজ্জ— যা তাদের হিসাবে যিলহজ্জে অনুষ্ঠিত হত, আসলে যিলহজ্জ মাসে হত না। কিন্তু জাহিলিয়্যাতের দীর্ঘ কাল পরিক্রমার পর এমন হয়ে গেল যে, ঐসব আরববাসীদের হিসাবে উদাহরণত যা মুহাররম মাস ছিল, সেটাই প্রকৃত আসমানী হিসাবেও মুহাররম মাস ছিল। এভাবে তাদের হিসাব অনুযায়ী যা যিলহজ্জ মাস ছিল, সেটাই প্রকৃত আসমানী হিসাব অনুযায়ী যিলহজ্জ মাস ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুত্বার শুরুতে একথাটিই বলেছেন এবং তিনি এভাবে বাতলে দিলেন যে, এই যে যিলহজ্জ মাস, যাতে এ হজ্জ আদায় হচ্ছে, এটা প্রকৃত আসমানী হিসাবেও যিলহজ্জ মাস, আর বছর বার মাসেই হয় এবং আগামীতে এ প্রকৃত ও আসল নিয়মই চলবে।

খুতবার শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতকে বিশেষ ওসিয়ত ও দিকনির্দেশনা এই দিয়েছেন যে, তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। যদি এমনটি হয়, তাহলে এটা হবে চরম গোমরাহীর কথা। এ ভাষণেরই কোন কোন বর্ণনায় ضُلَّالًا এর স্থলে كُفَّارًا শব্দ এসেছে— যার অর্থ এই হবে যে, পরস্পর মারামারি ও গৃহযুদ্ধ ইসলামের উদ্দেশ্য ও এর প্রাণবস্তুর বিপরীত কাফেরসুলভ একটি রীতি। যদি উম্মত এতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তারা ইসলামী নীতির স্থলে কাফেরসুলভ কর্মনীতি অবলম্বন করে নিয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ সতর্কবাণী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে শুনিয়েছিলেন। খুব সম্ভব এর কারণ এই ছিল যে, তিনি কোন না কোন পর্যায়ে একথা জানতে পেরেছিলেন যে, শয়তান এ উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে অনেকটা সফল হবে।

হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ

বিদায় হজ্জের আলোচনায় হজ্জের প্রায় সকল আমল ও কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ঘটনার রূপে এসে গিয়েছে। এখন পৃথক পৃথকভাবে এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও রুকনসমূহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশাবলী ও তাঁর কর্মপদ্ধতি জানার জন্য নিম্নের হাদীসগুলো পাঠ করে নিন।

মক্কায় প্রবেশ ও প্রথম তাওয়াফ

মক্কা শরীফকে আল্লাহ্ তা'আলা কাবা শরীফ সেখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে যে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং এটাকে আল্লাহ্র নিরাপদ শহর ও হজ্জের কেন্দ্র বানিয়েছেন, এর অনিবার্য দাবী হচ্ছে যে, এখানে প্রবেশ করতে গেলে সতর্কতা ও সম্মানের সাথে প্রবেশ করতে হবে। তারপর কাবা শরীফের দাবী হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম এর তাওয়াফ করতে হবে। তারপর এ কাবার এক কোণে স্থাপিত যে একটি পাথর (হাজরে আসওয়াদ) রয়েছে, এর দাবী হচ্ছে যে, তাওয়াফের সূচনা এটাকে আদব ও সম্মানের সাথে স্পর্শ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি এটাই ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে এটাই শিখেছিলেন।

(١٧٠) عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اِلاَّ بَاتَ بِذِى طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّىَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَاِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِى طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৭০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর খাদেম নাফে' থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যখনই মক্কায় আসতেন, তখন এখানে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি 'যি-তুওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। (এটা মক্কার নিকটবর্তী একটি জনপদ ছিল।) এখানে তিনি সকাল হলে গোসল করতেন ও নামায পড়তেন। তারপর দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি যখন মক্কা থেকে ফেরত যেতেন, তখনও যি-তুওয়ায় রাত্রি যাপন করে সকাল বেলা ফিরে যেতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। —বুখারী, মুসলিম

(١٧١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا * (رواه مسلم)

১৭১। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন, তখন সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন এবং এটাকে এসতেলাম করলেন। তারপর তিনি ডান দিক থেকে তাওয়াফ করলেন, যার মধ্যে প্রথম তিন চক্করে তিনি রমল করলেন এবং বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের 'এসতেলাম' দ্বারা শুরু হয়। এসতেলামের অর্থ হচ্ছে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়া অথবা এর উপর হাত রেখে অথবা হাত ঐ দিকে করে ঐ হাতকেই চুমু দেওয়া। এ এসতেলাম করেই তাওয়াফ শুরু করা হয় এবং প্রতিটি তাওয়াফে খানায়ে কাবাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

"রমল" এক বিশেষ ভঙ্গির চলনকে বলে, যার মধ্যে শক্তি ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ৭ম হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাআত নিয়ে উমরার জন্য মক্কা শরীফ আসলেন, তখন

সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পর বলাবলি করল যে, ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনার খারাপ আবহাওয়া, জ্বর ইত্যাদি রোগ-বালাই এ লোকদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে যখন একথা পৌঁছল তখন তিনি তাদেরকে হুকুম দিলেন যে, তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল অর্থাৎ, বীরদর্পে চলবে এবং এভাবে শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের মহড়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং এর উপরই আমল করা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ সময়ের এ ভঙ্গিমাটি এমন পছন্দ হল যে, এটাকে একটি পৃথক সুন্নত সাব্যস্ত করে দেওয়া হল। বর্তমানে এ পদ্ধতি ও নিয়মই চালু রয়েছে, হজ্জ অথবা উমরা পালনকারী প্রথম যে তাওয়াফটি করে এবং যার পর তাকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীও করতে হয়, এর প্রথম তিন চক্করে রমল করা হয় এবং বাকী চক্করগুলোতে স্বাভাবিক গতিতে চলা হয়।

(١٧٢) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَاشَاءَ وَيَدْعُوْ * (رواه ابوداؤد)

১৭২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কায় আসলেন। এখানে এসে তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে এর এসতেলাম করলেন। তারপর বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন। তারপর সাফার কাছে এসে এর এতটুকু উপরে উঠলেন, যেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ দেখা যায়। তারপর তিনি যতক্ষণ চাইলেন, দু'হাত তুলে আল্লাহ্র যিকির ও দো'আ করতে থাকলেন। —আবূ দাঊদ

(١٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৭৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করলেন। তিনি একটি মাথাবাঁকা ছড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে এসতেলাম করতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে মুসলিম শরীফের বরাতে হযরত জাবের থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াফের ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا (অর্থাৎ, তিনি হাজরে আসওয়াদকে এসতেলাম করার পর ডান দিকে হেঁটে গেলেন এবং তাওয়াফ শুরু করলেন। এর প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন, আর বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করলেন।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তাওয়াফ পায়ে হেঁটে করেছিলেন। আর হযরত আবূ হুরায়রার এ হাদীসে উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ দু'টি বর্ণনায় কোন বিরোধ নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মক্কায় পৌঁছার পর প্রথম তাওয়াফটি পায়ে হেঁটে করেছিলেন— হযরত জাবের (রাযিঃ)-এরই উল্লেখ করেছেন। তারপর দশই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কায় এসে যে তাওয়াফটি করেছিলেন, সেটা উটের উপর সওয়ার

হয়ে করেছিলেন— যাতে প্রশ্নকারীরা তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে এবং মাসআলা জেনে নিতে পারে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটটি যেন সে সময় তাঁর জন্য মিম্বর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আর সম্ভবত তিনি নিজের এ আমল দ্বারা একথাও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, বিশেষ অবস্থায় সওয়ারীর উপরও তাওয়াফ করা যায়।

(١٧٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَءُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৭৪। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম যে, আমি অসুস্থ। (তাই আমি তাওয়াফ কিভাবে করব?) তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করে নাও। আমি এভাবেই তাওয়াফ করে নিলাম। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ্র পাশে নামায পড়ছিলেন, আর এতে তিনি সূরা তূর তেলাওয়াত করছিলেন। —বুখারী, মুসলিম

(١٧٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ ذَالِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِيْ مَايَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ * (رواه البخارى ومسلم)

১৭৫। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে বের হলাম। এ সময় আমাদের মুখে হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনাই ছিল না। এভাবে আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, (যা মক্কা থেকে কেবল এক মন্‌যিল দূরে অবস্থিত।) তখন আমার হায়েয শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁবুতে) এসে দেখলেন যে, আমি বসে বসে কাঁদছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয়, তোমার মাসিক শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ব্যাপার এটাই। তিনি বললেন ঃ এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। তাই তুমি সব কাজ করে যাও, যা হাজীরা করে থাকে। তবে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ঐ পর্যন্ত করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তুমি এ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে যাও। —বুখারী, মুসলিম

(١٧٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ اِلاَّ اَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ اِلاَّ بِخَيْرٍ * (رواه الترمذى والنسائى والدارمى)

১৭৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা নামাযের মতই একটি এবাদত। তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা এতে কথা বলতে পার। অতএব, যে কেউ তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলে, সে যেন পুণ্য ও কল্যাণের কথাই বলে। (অহেতুক ও নাজায়েয কথাবার্তা দিয়ে সে যেন তাওয়াফকে কলুষিত না করে।) —তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী

(١٧٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مَسْحَهُمَا (اَلْحَجَرِ الْاَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيْ) كَفَّارَةٌ لِّلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اُسْبُوْعًا فَاَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ اُخْرٰى اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً * (رواه الترمذى)

১৭৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা গুনাহ্মাফীর কারণ হয়। আমি তাঁকে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে এবং যত্নসহকারে এর তাওয়াফ করবে (অর্থাৎ, সুন্নত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে) তার এ কাজটি একটি গোলাম আযাদ করার সমান হবে। আর আমি তাঁকে একথাও বলতে শুনেছি যে, তাওয়াফের সময় যখন কোন বান্দা এক পা মাটিতে রাখে আর এক পা উপরে উঠায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কদমে একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং একটি নেকী নির্ধারণ করে দেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শব্দমালা مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اُسْبُوْعًا এর তরজমা আমরা লিখেছি 'যে ব্যক্তি সাতবার তাওয়াফ করেছে'। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এখানে তিনটি অর্থের সম্ভাবনার কথা লিখেছেন ঃ (১) তাওয়াফের সাতটি চক্কর, (আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি তাওয়াফে বায়তুল্লাহ্কে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।) (২) সাতটি তাওয়াফ, যার মধ্যে ৪৯টি চক্কর হয়। (৩) একাধারে সাত দিন তাওয়াফ করা। তবে প্রথম অর্থটিই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। والله اعلم

হাজরে আসওয়াদ

(١٧٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ * (رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى)

১৭৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন এটাকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দু'টি চোখ থাকবে — যার দ্বারা সে দেখবে এবং

জিহ্বাও থাকবে— যার দ্বারা সে কথা বলবে। যারা এটা স্পর্শ করেছিল তাদের বেলায় সে সত্যসাক্ষ্য দিবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাজরে আসওয়াদ দেখতে পাথরের একটি টুকরা; কিন্তু এর মধ্যে একটি আত্মিক শক্তি রয়েছে। তাই সে প্রত্যেক ঐ বান্দাকে চিনতে পারে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এর সম্পর্কের কারণে আদব ও মহব্বতের সাথে সরাসরি, হাত ইশারায় অথবা কোন কিছুর মাধ্যমে এটাকে চুমু দেয় কিংবা হাতে স্পর্শ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি দিয়ে উঠাবেন, আর সে ঐ বান্দাদের বেলায় সাক্ষ্য দিবে, যারা আল্লাহ্র নির্দেশমত এশ্ক ও ভক্তির শান নিয়ে এটাকে স্পর্শ করত ও চুমু খেত।

(١٧٩) عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا اَنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَاقَبَّلْتُكَ * (رواه البخارى ومسلم)

১৭৯। আবেস ইবনে রবীআ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর (রাযিঃ)কে দেখেছি যে, তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতেন এবং বলতেন, আমি ভাল করেই জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কোন উপকারও করতে পার না এবং কোন ক্ষতিও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমু খেতাম না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওমর (রাযিঃ) এ কথাটি এমন ঘোষণা দিয়ে ও সবার সামনে এজন্য বললেন, যাতে কোন দীক্ষাবঞ্চিত নতুন মুসলমান হযরত ওমর ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতে দেখে এটা মনে না করে বসে যে, এ পাথরে কোন খোদায়ী গুণ অথবা ভাল-মন্দের কোন শক্তি আছে এবং এ জন্যই এটাকে চুমু দেওয়া হয়।

হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর একথা দ্বারা একটি মৌলিক বিষয় এই জানা গেল যে, কোন জিনিসের যে তাযীম ও সম্মান এ দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয় যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম, এ তাযীম ও সম্মান যথার্থ। কিন্তু কোন মাখলূককে যদি লাভ-ক্ষতি এবং উপকার-অপকারের মালিক মনে করে এর সম্মান করা হয়, তাহলে এটা শির্কের একটি শাখা হবে এবং ইসলামে এর কোন সুযোগ ও অবকাশ নেই।

তাওয়াফে যিকির ও দো'আ

(١٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (رواه ابوداؤد)

১৮০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাওয়াফের অবস্থায়) রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে এ দো'আ পড়তে শুনেছি ঃ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - —আবূ দাঊদ

(١٨١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِّلَ بِهٖ سَبْعُوْنَ مَلَكًا (يَعْنِى الرُّكْنُ

الْيَمَانِي) فَمَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْا اٰمِيْنَ * (رواه ابن ماجة)

১৮১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুকনে ইয়ামানীর উপর সত্তরজন ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যখন এ দো'আ করে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ- তখন তারা আমীন বলে। —ইবনে মাজাহ্

ওকূফে আরাফার গুরুত্ব ও ফযীলত

হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে ৯ই যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে ওকূফ ও অবস্থান করা। এটা যদি এক মুহূর্তের জন্যও লাভ হয়ে যায়, তাহলে হজ্জ নসীব হয়ে যায়। আর যদি কোন কারণে কোন হাজী এ দিন ও এর পরের রাতের কোন অংশেই আরাফায় পৌঁছতে না পারে, তাহলে তার হজ্জ ফওত হয়ে যায় অর্থাৎ, এ বছর তার হজ্জই ছুটে গেল। হজ্জের অন্যান্য রুকন ও কর্মকান্ড যথা তাওয়াফ, সায়ী, রমী ইত্যাদি যদি ছুটে যায়, তাহলে এগুলোর কোন না কোন কাফ্‌ফারা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ওকূফে আরাফা ছুটে গেলে এর কোন কাফ্‌ফারা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেই।

(١٨٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ * (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى، وابن ماجة والدارمى)

১৮২। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামুর দুআলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হজ্জ হচ্ছে ওকূফে আরাফার নাম। (অর্থাৎ, এটা এমন রুকন, যার উপর হজ্জ নির্ভর করে।) যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতেও সুবহে সাদেকের পূর্বে আরাফায় পৌঁছে গেল, সে হজ্জ পেয়ে গেল। (কুরবানীর দিন অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জের পর) মিনায় অবস্থানের দিন হচ্ছে তিনটি। (অর্থাৎ, ১১, ১২, ও ১৩ই যিলহজ্জ— যে দিনগুলোতে রমী করা হয়।) কেউ যদি দু'দিনে (অর্থাৎ, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ রমী করে) তাড়াতাড়ি মিনা থেকে চলে যায়, তাহলে এতে কোন গুনাহ্ নেই, আর কেউ যদি অতিরিক্ত একদিন থেকে (১৩ তারিখে রমী করে) সেখানে থেকে যায়; তাহলে এতেও কোন গুনাহ্ নেই। —তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু ওকূফে আরাফার উপর হজ্জ নির্ভর করে, তাই এর মধ্যে এতটুকু সুযোগ রাখা হয়েছে যে, কেউ যদি ৯ই যিলহজ্জ দিনের বেলা আরাফায় পৌঁছতে না পারে, (যা হচ্ছে ওকূফের আসল সময়,) সে যদি পরবর্তী রাতের কোন অংশেও সেখানে পৌঁছে যায়, তাহলে তার ওকূফ আদায় হয়ে যাবে এবং সে হজ্জ থেকে বঞ্চিত গণ্য হবে না।

আরাফার দিনের পরের দিনটি অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ হচ্ছে কুরবানীর দিন। এ দিন একটি জামরায় রমী, কুরবানী ও মাথা মুড়ানোর পর এহ্‌রামের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায় এবং এ দিনেই মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয়। তারপর মিনায় বেশীর চেয়ে বেশী তিন দিন আর কমপক্ষে দু'দিন অবস্থান করে তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করা হজ্জের আহ্‌কামের অন্তর্ভুক্ত। তাই কোন ব্যক্তি যদি ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করে মিনা থেকে চলে যায়, তাহলে তার উপর কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। আর কেউ যদি ১৩ তারিখও অবস্থান করে এবং পাথর নিক্ষেপ করে নেয়, তাহলে এটাও জায়েয।

(١٨٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَاارَادَ هٰؤُلَاءِ * (رواه مسلم)

১৮৩। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দিন নেই, যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আরাফার দিনের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা করে থাকেন। (অর্থাৎ, বছরের ৩৬০ দিনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আকারে মাগফেরাত ও জাহান্নাম মুক্তির ফায়সালা আরাফার দিনেই হয়ে থাকে।) এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্ষমা ও দয়াগুণ নিয়ে (আরাফাতে সমবেত বান্দাদের) খুবই কাছে আসেন। তারপর তাদের উপর গর্ব করে ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেন, এরা কী প্রত্যাশা করে! —মুসলিম

(١٨٤) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رُأِىَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلَا اَدْحَرُ وَلَا اَحْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرٰى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ * (رواه مالك مرسلا)

১৮৪। তাল্‌হা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তানকে কোন দিনই এত বেশী অপমানিত, এত বেশী ধিকৃত, এত বেশী হীন ও এত বেশী আক্রোশে আক্রান্ত দেখা যায় নাই, যতটুকু আরাফা দিবসে দেখা যায়। আর এটা কেবল এ জন্য যে, সে এ দিন আল্লাহ্‌র রহমত (যা মুষল ধারায়) বর্ষিত হতে এবং বড় বড় গুনাহ্‌ও আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমা হতে দেখতে পায়। (আর অভিশপ্ত শয়তানের জন্য এটা বড়ই অসহনীয়।) —মুয়াত্তা মালেক ঃ মুরসাল

ব্যাখ্যা ঃ আরাফাতের বরকতময় ময়দানে যিলহজ্জের নয় তারিখে– যা রহমত ও বরকত নাযিলের বিশেষ দিন– যখন হাজার হাজার অথবা লাখ লাখ বান্দা ফকীরের বেশ ধারণ করে সমবেত হয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের ও অন্যদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ ও রোনাযারী করে, তখন আরহামুর রাহিমীনের রহমতের অতল দরিয়ায় ঢেউ জাগে। তারপর তিনি নিজ অনুগ্রহের শান অনুযায়ী গুনাহ্‌গার বান্দাদের মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে তাদের

মুক্তির ফায়সালা করে দেন। এর ফলে শয়তান জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে এবং নিজের মাথা ঠুকতে থাকে।

শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ

মিনায় বেশ দূরত্বে দূরত্বে তিনটি স্থানে, তিনটি স্তম্ভ বানিয়ে রাখা হয়েছে। এ স্তম্ভগুলোকেই 'জামরা' বলা হয়। এসব জামরায় শয়তানকে কংকর মারাও হজ্জের আমল ও আহ্‌কামের অন্তর্ভুক্ত। ১০ই যিলহজ্জ কেবল একটি জামরায় সাতটি কংকর মারা হয়, আর ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তিনটি জামরাতেই কংকর মারা হয়। একথা স্পষ্ট যে, কংকর মারা স্বয়ং কোন নেক আমল নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশযুক্ত হলে প্রতিটি কাজেই এবাদতের শান পয়দা হয়ে যায়। আর বন্দেগী ও দাসত্ব এটাই যে, কোন আপত্তি ও কারণ তালাশ করা ছাড়াই আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে নেওয়া হবে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বান্দারা যখন আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের ধ্যান করে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে শয়তানী ধ্যান-ধারণা ও নিজের কুপ্রবৃত্তি ও গুনাহকে কল্পনার জগতে টার্গেট বানিয়ে এসব জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে এবং এভাবে গোমরাহী ও পাপকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তখন তাদের অন্তরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাদের ঈমানভরা বক্ষে যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ হয় এর স্বাদ কেবল তারাই জানে। যাহোক, আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে জামরাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করাও দৃষ্টিবানদের চোখে একটি ঈমান উদ্দীপক আমল।

(١٨٥) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ رَمْىُ الْجِمَارِ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لاِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ * (رواه الترمذى والدارمى)

১৮৫। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামরায় কংকর মারা ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আল্লাহ্‌র যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। —তিরমিযী, দারেমী

(١٨٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ * (رواه البخارى ومسلم)

১৮৬। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় কংকর মেরেছেন চাশ্‌তের সময়, আর পরের দিনগুলোতে তিনি কংকর মেরেছেন সূর্য হেলে যাওয়ার পর। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এটাই সুন্নত যে, ১০ই যিলহজ্জ জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের কাজ দুপুরের আগেই করে নেবে, আর পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য হেলে যাওয়ার পর।

(١٨٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهٖ وَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَمٰى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

contents

১৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি কংকর মারার জন্য জামরাতুল কুবরার কাছে পৌঁছলেন এবং ব্বায়তুল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ, মক্কার দিককে) নিজের বাম দিকে রেখে এবং মিনার দিককে ডান দিকে রেখে এতে সাতটি কংকর মারলেন। প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলছিলেন। তারপর বললেন ঃ এভাবেই কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন ঐ মহান ব্যক্তি, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল। (যার মধ্যে হজ্জের আহ্‌কাম ও বিধি-বিধানের বর্ণনা রয়েছে।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কংকর মারার নিয়ম-পদ্ধতিটি বিস্তারিতভাবে মনে রেখেছিলেন। তিনি সে অনুযায়ী আমল করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের আহ্‌কাম নাযিল করেছিলেন– তিনি এভাবেই কংকর নিক্ষেপ করতেন।

(١٨٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ لِتَاْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّيْ لَا اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ * (رواه مسلم)

১৮৮। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন তাঁর বাহনে থেকে কংকর মারতে দেখেছি। তিনি এ সময় বলছিলেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের আহ্‌কাম শিখে নাও। কেননা, আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজ্জের পর আমি আর কোন হজ্জ করতে পারব না। (আর তোমরাও আর শিখার সুযোগ পাবে না।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ১০ই যিলহজ্জ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উটনীর উপর সওয়ার হয়ে মুযদালিফা থেকে মিনায় এসে পৌঁছুলেন। এ দিন তিনি সওয়ারীর উপর থেকেই জামরায়ে আকাবায় কংকর মারলেন– যাতে সবাই তাঁকে রমী করতে দেখে রমী ও কংকর মারার নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নেয় এবং সহজে বিভিন্ন মাসআলা ও হজ্জের বিধি-বিধান জিজ্ঞাসা করে নিতে পারে। তবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন পায়ে হেঁটে কংকর মেরেছেন। যাহোক, কংকর মারা সওয়ার অবস্থায়ও জায়েয, আর পায়ে হেঁটেও জায়েয।

এ ইঙ্গিত বিদায় হজ্জে তিনি বার বার দিয়েছেন যে, ঈমানদাররা আমার নিকট থেকে যেন হজ্জ, দ্বীন ও শরীঅতের অন্যান্য আহ্‌কাম শিখে নেয়। সম্ভবত এখন এই দুনিয়ায় আমার অবস্থান আর বেশী দিনের হবে না।

(١٨٩) عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيْلاً وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَاْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهٗ * (رواه البخارى)

১৮৯। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি শয়তানকে কংকর মারার সময় প্রথমে জামরায়ে উলায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর নিম্নভূমিতে অবতরণ করে কেবলামুখী হয়ে অনেক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন। এরপর জামরায়ে উস্তায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর বাম দিকে নিম্নভূমিতে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘক্ষণ হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন। এরপর জামরায়ে আকাবায় গিয়ে বতনে ওয়াদী থেকে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলতেন; কিন্তু এখানে তিনি দাঁড়াতেন না। তারপর ফিরে যেতেন এবং বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই কংকর মারতে দেখেছি। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় কংকর মারার পর নিকটবর্তী স্থানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দো'আ করতেন, আর শেষ জামরায় কংকর মারার পর এখানে না দাঁড়িয়ে এবং দো'আ না করেই ফিরে যেতেন। এটাই সুন্নত নিয়ম। আফসোস! আমাদের এ যুগে এ সুন্নতের উপর আমলকারী; বরং এ মাসআলাটি জানে এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম।

কুরবানী

কুরবানীর ফযীলত ও এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ দিকনির্দেশনা 'কিতাবুস্ সালাতে' ঈদুল আযহার বর্ণনায় করা হয়েছে। আর বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিজ হাতে ৬৩টি উট কুরবানী করেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশে হযরত আলী (রাযিঃ) ৩৭টি উট কুরবানী করেছিলেন, এর উল্লেখ বিদায় হজ্জের বর্ণনায় এসে গিয়েছে। এখানে কুরবানী সম্পর্কে কেবল দু'তিনটি হাদীস পাঠ করে নিন ঃ

(١٩٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عَنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ) قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَءُ * (رواه ابوداؤد)

১৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন। (অর্থাৎ, আরাফার দিনের মত কুরবানীর দিনটিও খুবই মর্যাদাপূর্ণ।) তারপর হচ্ছে এর পরের দিন। (অর্থাৎ, ১১ই যিলহজ্জ। তাই যতদূর সম্ভব, কুরবানী ১০ তারিখেই করে নেওয়া চাই।) আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঁচটি অথবা ছয়টি উট কুরবানী করার জন্য আনা হল। এ সময় এগুলোর প্রত্যেকটিই তাঁর কাছে ঘেঁষতে লাগল– যাতে তিনি প্রথমে এটাকেই যবাহ্ করেন। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ কুদরত ও শক্তি রয়েছে যে, তিনি পশুদের মধ্যে এমনকি মাটি, পাথর ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও বাস্তবতার অনুভূতি সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এই যে, ৫/৬টি উট, যেগুলো কুরবানীর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

খেদমতে নিয়ে আসা হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সময় এ অনুভূতি ও জ্ঞান পয়দা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্র রাহে এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তাদের কুরবানী হওয়া কত বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ জন্য এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ঘেঁষতে লাগল যে, প্রথমে যেন আমাকেই যাবাহ্ করা হয়।

কবির ভাষায় ঃ

همه آهوان صحراء سر خود نهاده بركف

به اميدانكه روزے به شكار خواهى آمد

মরুর হরিণগুলো নিজের মস্তক হাতের মুঠোয় করে এ আশায় দাঁড়িয়ে আছে যে, একদিন আমার প্রিয়তম আমাকে শিকার করতে আসবে।

(١٩١) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَئٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِىْ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذَالِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَاَرَدْتُّ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهِمْ * (رواه البخارى ومسلم)

১৯১। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক বছর ঈদুল আযহার সময়) বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ কুরবানী করবে, তার ঘরে যেন তৃতীয় দিনের পর কুরবানীর কোন গোশ্ত অবশিষ্ট না থাকে। তারপর যখন পরবর্তী বছর আসল, তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এবারও তাই করব, যেমন গত বছর করেছিলাম ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ (তিন দিনের ঐ বাধ্যবাধকতা এবার আর নেই, তাই তোমরা যতদিন ইচ্ছা) খাও, অন্যদেরকে খেতে দাও এবং ইচ্ছা করলে সংরক্ষণ করে রাখ। গত বছর মানুষের খাবারের অভাব ও কষ্ট ছিল, এ জন্য আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা কুরবানীর গোশ্ত দ্বারা তাদের সাহায্য করবে। —বুখারী, মুসলিম

(١٩٢) عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلْثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا اَلاَ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ * (رواه ابوداؤد)

১৯২। নুবাইশা হুযালী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে তোমাদের সবাই ভালভাবে গোশ্ত খেতে পারে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। এজন্য এখন তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকেও খেতে দাও এবং কুরবানীর সওয়াবও লাভ কর। আর এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহ্র স্মরণের। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ উপরের দু'টি হাদীস দ্বারাই জানা গেল যে, কুরবানীর গোশ্তের বেলায় অনুমতি রয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা খাওয়া যায় এবং রাখা যায়। আর শেষ হাদীসটির শেষ বাক্য দ্বারা জানা গেল যে, আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহ্র বান্দাদের খাওয়া ও পান করাও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ। এ দিনগুলো যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মেহমানদারী ও আপ্যায়নের দিন। তবে এই খাওয়া দাওয়ার সাথে আল্লাহ্র স্মরণ, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা, তাঁর পবিত্রতা ও তাওহীদের বাণী উচ্চারণ দ্বারা রসনাকে সিক্ত রাখা চাই। এর সংমিশ্রণ ছাড়া আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দাদের জন্য জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তো বিস্বাদ।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফে বিদা

হজ্জের আমল ও আরকান এবং এগুলোর ক্রমধারা দ্বারা বুঝা যায় যে, এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্র সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং এর সাথে নিজের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটানো, যা মিল্লাতে ইব্রাহীমীর বিশেষ প্রতীক। এ জন্য মক্কা শরীফে উপস্থিত হওয়ার পর হজ্জের সর্বপ্রথম কাজ তাওয়াফই করতে হয় এবং তাওয়াফের দু'রাকআত নামায এর পরে পড়া হয়। হাজীদের এ প্রথম তাওয়াফের প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক নামই হচ্ছে তাওয়াফে কুদূম। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে।

এরপর ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী ও মাথা মুড়ানোর পর একটি তাওয়াফের বিধান রয়েছে। এর প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক নাম তাওয়াফে যিয়ারত। ওকূফে আরাফার পর এটাই হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তারপর হজ্জ শেষ করে একজন হাজী যখন মক্কা শরীফ থেকে নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়, তখন নির্দেশ রয়েছে যে, সে যেন সবশেষে বিদায়ী তাওয়াফ করে দেশে ফিরে এবং তার হজ্জের সর্বশেষ কাজও যেন তাওয়াফই হয়। এর প্রসিদ্ধ ও পারিভাষিক নাম হচ্ছে তওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। এ দু'টি তাওয়াফ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(١٩٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ *

(رواه ابوداؤد وابن ماجة)

১৯৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফে যিয়ারতের সাতটি চক্করে রমল করেন নাই। (অর্থাৎ, সম্পূর্ণ তাওয়াফ স্বাভাবিক গতিতে করেছেন।) —আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, কোন হাজী যখন মক্কা শরীফ হাজির হয়ে প্রথম তাওয়াফ করবে (যার পর সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীও করতে হবে,) তখন এ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে সে রমল করবে। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এমনটিই করেছিলেন। এরপর ১০ই যিলহজ্জ তিনি মিনা থেকে মক্কায় এসে তওয়াফে যিয়ারত করলেন; কিন্তু এতে তিনি রমল করেননি। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর এ হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

(١٩٤) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ * (رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة)

১৯৪। হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশই যিলহজ্জের রাত পর্যন্ত তওয়াফে যিয়ারতকে বিলম্বিত করেছেন। (অর্থাৎ, এ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার অনুমতি ও অবকাশ দিয়েছেন।) —তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, তওয়াফে যিয়ারতের জন্য উত্তম দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন, অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবকাশ দিয়েছেন যে, এ দিনটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাতের বেলায়ও এটা করা যায়। আর এ রাতের তাওয়াফও ফযীলত হিসাবে ১০ই যিলহজ্জের তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে।

সাধারণ আরবী হিসাবের নিয়ম অনুযায়ী রাতের তারিখটি পরবর্তী দিনের তারিখ হয় এবং প্রতিটি রাত পরের দিনের সাথে যুক্ত হয়। (যেমন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতটি পরবর্তী দিন অর্থাৎ, শুক্রবারের রাত ধরা হয়।) কিন্তু হজ্জের কার্যক্রম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বান্দাদের সুবিধার জন্য এর বিপরীত নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক দিবাগত রাতকে ঐ দিনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে যে তাওয়াফটি ১০ই যিলহজ্জ দিন পার হয়ে যাওয়ার পর রাতের বেলায় করা হবে, সেটা ১০ই যিলহজ্জের তাওয়াফ হিসাবেই গণ্য হবে— যদিও সাধারণ নিয়ম হিসাবে এটা ১১ই যিলহজ্জের রাত।

(١٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ اِلَّا اَنَّهٗ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৯৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা (হজ্জ করার পর) চতুর্দিক থেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত (এবং বিদায়ী তাওয়াফের কোন গুরুত্ব দিত না।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দেশের দিকে ফিরে না যায়, যে পর্যন্ত না তার শেষ উপস্থিতি ও সাক্ষাত হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফের সাথে। তবে ঋতুমতীদেরকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, বিদায়ী তাওয়াফ তাদের জন্য মাফ।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেমন স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম প্রথম লোকেরা বিদায়ী তাওয়াফের প্রতি যত্নবান থাকত না। ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে কংকর মারা ইত্যাদি হজ্জের কাজ সেরে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দ্বারা যেন এর গুরুত্ব ও ওয়াজিব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম তাওয়াফে বিদাকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী যেসব মহিলা এ সময় তাদের বিশেষ দিন আসার কারণে তাওয়াফ করতে অপারগ,

তারা যদি আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়ে থাকে, তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ না করেই দেশে ফিরে যেতে পারবে। তাদের ছাড়া প্রত্যেক বহিরাগত হাজীর জন্য যরূরী যে, তারা দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে বিদায়ের নিয়তেই শেষ ও বিদায়ী তাওয়াফ করে নিবে। আর এটাই হজ্জ সংক্রান্ত তার শেষ কাজ।

(١٩٦) عَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ * (رواه احمد)

১৯৬। হযরত হারেস সাকাফী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ অথবা উমরা করে, তার শেষ সাক্ষাত যেন বায়তুল্লাহ্র সাথে হয় এবং শেষ কাজ যেন তাওয়াফ হয়। —মুসনাদে আহমাদ

(١٩٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِيْ وَاَنْتَظَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ وَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهٖ ثُمَّ خَرَجَ * (رواه ابوداؤد)

১৯৭। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে মক্কা থেকে মদীনা ফিরে যাওয়ার রাতে) আমি তানয়ীম নামক স্থানে গিয়ে উমরার এহ্রাম বাঁধলাম এবং উমরার কাজ (তাওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি) সমাধা করলাম। এ দিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিনা ও মক্কার মাঝে) আবতাহ নামক স্থানে আমার অপেক্ষায় থাকলেন। আমি যখন উমরার কাজ সমাধা করে নিলাম, তখন তিনি লোকদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন এবং তিনি বিদায়ী তাওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্র কাছে আসলেন। এখানে এসে তিনি তাওয়াফ করলেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বিদায় হজ্জের সময় যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন তিনি তামাত্তু হজ্জের ইচ্ছা করেছিলেন এবং এ জন্য উমরার এহ্রাম বেঁধে ছিলেন। কিন্তু যখন মক্কা শরীফের কাছে পৌঁছলেন, তখন তার হায়েয শুরু হয়ে গেল, যে কারণে তিনি উমরার তাওয়াফ ইত্যাদি কিছুই করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে উমরা ছেড়ে দিয়ে ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের এহ্রাম বেঁধে নিলেন এবং তাঁর সাথে সম্পূর্ণ হজ্জ আদায় করলেন। ১৩ই যিলহজ্জ শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, তখন আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং এখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐ রাতেই তিনি হযরত আয়েশাকে তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের সাথে পাঠালেন, যেন তিনি হরমের সীমানার বাইরে তানয়ীমে গিয়ে সেখান থেকে উমরার এহ্রাম বেঁধে উমরা আদায় করে এখানে এসে যান। এ হাদীসে ঐ ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা যখন উমরা সমাধা করে আসলেন, তখন তিনি কাফেলাকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। কাফেলা আবতাহ থেকে মসজিদুল হারামে আসল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর

সাথীগণ শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করলেন এবং তখনই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর এ উমরাটি ঐ উমরার কাযা ছিল, যা এহ্রাম বাঁধা সত্ত্বেও তিনি তখন করতে পারেননি। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বিদায়ী তাওয়াফ মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের সময়ই করা চাই।

তাওয়াফের পর মুলতাযামকে জড়িয়ে ধরে দো'আ করা

খানায়ে কাবার দেওয়ালের প্রায় দু'গজ জায়গা যা হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরওয়াজার মাঝে অবস্থিত– এটাকে 'মুলতাযাম' বলা হয়। হজ্জের সুন্নত কাজসমূহের মধ্যে এটাও একটি সুন্নত যে, যদি সুযোগ হয়, তাহলে তাওয়াফের পর এটাকে জড়িয়ে ধরে দো'আ করবে। নিম্নের হাদীস থেকে জানা যাবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় এমনই করেছিলেন।

(١٩٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَطُوْفُ مَعَ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ وَرَأَيْتُ قَوْمًا اِلْتَزَمُوا الْبَيْتَ فَقُلْتُ لَهٗ اِنْطَلِقْ بِنَا نَلْتَزِمُ الْبَيْتَ مَعَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهٖ اِلْتَزَمَ الْبَيْتَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْحَجْرِ وَقَالَ هٰذَا وَاللّٰهِ الْمَكَانُ الَّذِيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْتَزَمَهٗ * (رواه البيهقى بهذا للفظ)

১৯৮। আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা শু'আইব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার দাদা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাযিঃ)-এর সাথে তাওয়াফ করছিলাম। এ সময় আমি কিছু লোককে দেখলাম যে, তারা বায়তুল্লাহ্কে জড়িয়ে ধরছে। আমি আমার দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর)-কে বললাম, আমাকে এখানে নিয়ে চলুন, আমরাও তাদের সাথে বায়তুল্লাহ্কে জড়িয়ে ধরি। তিনি বললেন, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (সম্ভবত এ কথার মর্ম এই ছিল যে, আমি যদি তাওয়াফের মাঝে ঐ লোকদের মত মুলতাযামের আসল জায়গার প্রতি লক্ষ্য না রেখে বায়তুল্লাহ্র কোন দেওয়ালকে জড়িয়ে ধরি, তাহলে এটা সুন্নতের খেলাফ ও ভুল হবে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ খুশী হবেন না; বরং শয়তান খুশী হবে। আর আমি শয়তানকে খুশী করতে চাই না; বরং তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।)

শু'আইব বলেন, তারপর আমার দাদা যখন তাওয়াফ থেকে ফারেগ হলেন, তখন কাবার দেওয়ালের ঐ বিশেষ স্থানে আসলেন– যা কাবার দরওয়াজা ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে অবস্থিত (যাকে মুলতাযাম বলা হয়) এবং আমাকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটাই ঐ জায়গা, যাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। —বায়হাকী

আর আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মুলতাযামকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, নিজের বুক ও চেহারা এর সাথে লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং হাতও সম্পূর্ণ জড়িয়ে দিয়ে এর উপর রেখে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপই করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মুলতাযামকে জড়িয়ে ধরার এ আমলটি তাওয়াফের পরে হওয়া চাই এবং এর নির্দিষ্ট জায়গা মুলতাযামই। আল্লাহ্র প্রেমিকদের তখন মনের যে অবস্থা হয়, এটা কেবল তাদেরই অংশ, আর এটা হচ্ছে হজ্জের আবেগময় বিশেষ অবস্থাসমূহের একটি।

হারামাইন শরীফাইনের মর্যাদা ও ফযীলত

মুহাদ্দেসীনে কেরামের রীতি এই যে, তারা কিতাবুল হজ্জেই হারামাইন শরীফাইনের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসগুলোও এনে থাকেন। এ নীতির অনুসরণেই এখানে হরমে মক্কা ও হরমে মদীনার ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লেখ হচ্ছে।

মক্কার হরমের সম্মান ও মর্যাদা

খানায়ে কা'বাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন ঘর সাব্যস্ত করেছেন। আর এ ঘরটি যেহেতু মক্কা শহরে অবস্থিত, এজন্য এ শহরটাকেও আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ শহর নামে অভিহিত করেছেন। বিষয়টি যেন এমন, যেভাবে দুনিয়ার সমস্ত ঘরের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে কা'বা ঘরের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনিভাবে পৃথিবীর সকল শহরের মধ্যে মক্কা শহরের সাথে আল্লাহ্র সম্বন্ধের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তারপর এ সম্বন্ধের কারণেই এর প্রতিটি দিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকাকে 'হরম' (অর্থাৎ, অবশ্য সম্মানার্হ) সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর বিশেষ আদব ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। এ আদব ও সম্মানের কারণেই এখানে এমন অনেক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে যেগুলো নিষিদ্ধ নয়। যেমন, এ সীমানার মধ্যে কারো জন্য কোন প্রাণী শিকার করার অনুমতি নেই, যুদ্ধ ও লড়াইয়ের অনুমতি নেই, বৃক্ষ কাটা– এমনকি কোন বৃক্ষের পাতা ছেঁড়ারও অনুমতি নেই। এ সম্মানিত এলাকার মধ্যে এসব জিনিসকে আদব ও সম্মানের পরিপন্থী পাপাচারী সুলভ অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ হরম এলাকার সীমানা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্ধারণ করেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যুগে এরই নবায়ন করেছেন। আর বর্তমানে ঐসব সীমানা সবার কাছেই সুপরিচিত। হরম সীমানার এ সম্পূর্ণ এলাকাটি যেন আল্লাহ্র সম্মানিত শহরের (মক্কার) বিরাট প্রাঙ্গন। আর এর আদব ও সম্মানও তেমনিভাবে ওয়াজিব, যেমনিভাবে আল্লাহ্র পবিত্র শহর মক্কার আদব ও সম্মান ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(١٩٩) عَنْ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذَالِكَ هَلَكُوْا * (رواه ابن ماجة)

১৯৯। আইয়াশ ইবনে আবী রবী'আ মাখযূমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মত যে পর্যন্ত মক্কার এ সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে, সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের উপর থাকবে। আর যখন তারা এটা বিনষ্ট করে দিবে, তখন ধ্বংস হয়ে যাবে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ বায়তুল্লাহ শরীফ, মক্কা মুকাররমা ও সম্পূর্ণ হরম এলাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা যেন আল্লাহ্র সাথে বন্দেগীর সঠিক সম্পর্ক ও খাঁটি বিশ্বস্ততার লক্ষণ ও নিদর্শন। যে পর্যন্ত এ জিনিসটি উম্মতের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের হেফাযত করবেন এবং তারা দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মানের সাথে থাকবে। আর যখন উম্মতের এ আচরণ সামগ্রিকভাবে বদলে যাবে এবং খানায়ে কা'বা ও পবিত্র হরমের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তাদের মধ্যে ত্রুটি এসে যাবে, তখন উম্মত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও হেফাযতের অধিকার হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে ধ্বংস ও অনিষ্ট তাদের উপর চেপে বসবে।

আমাদের এ যুগে সফরের বিভিন্ন সুবিধার কারণে এবং আরো অন্যান্য কিছু সুযোগের কারণে যদিও হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু সেখানে সারা পৃথিবী থেকে যেসব মুসলমান আগমন করে, তাদের কর্মধারা বলে যে, বায়তুল্লাহ্ ও পবিত্র হরমের আদব ও সম্মানের দিক দিয়ে উম্মতের মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় বিরাট ত্রুটি এসে গিয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এটাও ঐসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম, যেগুলোর কারণে উম্মত পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَعَامِلْنَا بِمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَلاَ تُعَامِلْنَا بِمَا نَحْنُ اَهْلُهٗ

(٢٠٠)عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنَّ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاِنَّهٗ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَيُعْضَدُ شَوْكُهٗ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهٗ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهٗ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرُ فَاِنَّهٗ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ * (رواه البخارى ومسلم)

২০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ এখন আর হিজরতের হুকুম নেই, কিন্তু জেহাদ ও এর সংকল্প। আর যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন বেরিয়ে পড়। আর ফাত্হে মক্কার দিন তিনি এ ঘোষণাও করেছেন ঃ আল্লাহ্ এ মক্কা শহরকে সেদিন থেকেই সম্মানিত সাব্যস্ত করেছেন, যেদিন তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এটা আল্লাহ্র সম্মানে কেয়ামত পর্যন্তই সম্মানার্হ। আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বে কাউকে এখানে জেহাদের অনুমতিও দেননি, আর আমাকেও কেবল দিনের সামান্য সময়ের জন্য সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই ঐ সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এখন কেয়ামত পর্যন্তই এটা সম্মানার্হ। এখানকার কোন কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না, এখানকার কোন শিকারযোগ্য প্রাণীকেও উত্যক্ত করা যাবে না, এখানের রাস্তায় পড়া কোন জিনিসও কেউ কুড়িয়ে উঠাতে পারবে না— তবে কেউ যদি ঘোষণা ও প্রচারের নিয়তে এমন করে— এখানের সবুজ

ঘাসও কাটা যাবে না। এ কথা শুনে হযরত আব্বাস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইযখিরকে এর বাইরে রাখুন। কেননা, এখানকার কামাররা এটা ব্যবহার করে এবং ঘরের চালেও এটা কাজে লাগে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ইযখির বাদ। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি মক্কা বিজয়ের দিন বিশেষভাবে করেছিলেন। প্রথম ঘোষণাটি এই ছিল, "এখন আর হিজরতের হুকুম নেই।" এর মর্ম বুঝার আগে এ কথা জানা জরুরী যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন মক্কায় কাফের ও মুশরিকদের কর্তৃত্ব ছিল– যারা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল এবং তখন মক্কায় থেকে কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী জীবন-যাপন করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তখন নির্দেশ ছিল যে, আল্লাহ্র যে বান্দারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জন্য যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে যায়– যা তৎকালে ইসলামের কেন্দ্রভূমি ও সারা পৃথিবীতে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র ছিল। যাহোক, এ ধরনের বিশেষ অবস্থায় এ হিজরত ফরয ছিল এবং এর বিরাট ফযীলত ও গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ৮ম হিজরীতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা মুকাররমায়ও ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, তখন হিজরতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল। এ জন্য তিনি মক্কা বিজয়ের দিনই ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন হিজরতের ঐ হুকুম উঠিয়ে নেওয়া হল। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ঐসব লোকদের মনে খুবই আক্ষেপ ও নৈরাশ্য এসে গিয়ে থাকবে, যারা এখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের বিরাট ফযীলতের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। তাদের এ আক্ষেপ ও আফসোস দূর করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হিজরতের ফযীলত ও সৌভাগ্যের দরওয়াজা যদিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু জেহাদের পথ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সকল নির্দেশ পালনের নিয়ত ও আল্লাহ্র দ্বীনকে উচ্চে ধারণ করার পথে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ় সংকল্পের দরওয়াজা এখনও খোলা রয়েছে। আর যে কোন বড় ধরনের সৌভাগ্য ও ফযীলত এসব পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্র যে কোন বান্দাই লাভ করতে পারে।

মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় ঘোষণাটি এ দিয়েছিলেন যে, এ মক্কা নগরীর মর্যাদা ও সম্মান যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং যা সর্বজন স্বীকৃত— এটা কেবল রসম ও প্রথা অথবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি নির্দেশে চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার এ হুকুম যে, এর বিশেষ আদব ও সম্মান বজায় রাখতে হবে। এমনকি আল্লাহ্র জন্য জেহাদ ও যুদ্ধ যা একটি উঁচু স্তরের এবাদত ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এখানে এরও অনুমতি নেই। আমার পূর্বে কাউকে সাময়িক ভাবেও এর অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমাকেও কেবল অল্প সময়ের জন্য এর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আর এটাও ঐ সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কোন বান্দার জন্য এখানে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই। যেভাবে বিশেষ সরকারী এলাকার জন্য বিশেষ বিধান ও আইন থাকে, সেভাবে এখানের জন্যও বিশেষ আদব ও আইন রয়েছে। আর এগুলো তাই, যা এ ক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করেছেন। প্রায় এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

(٢٠١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ * (رواه مسلم)

২০১। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমানের জন্য মক্কায় অস্ত্র বহণ করা জায়েয নয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উম্মতের জমহুর আলেমদের নিকট এ হাদীসের মর্ম এই যে, মক্কা ও হরম সীমানার কোন মুসলমানের পক্ষে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এবং এটা ব্যবহার করা জ ায়েয নয়। এটা এ পবিত্র স্থানের আদবের পরিপন্থী। এর এ অর্থ নয় যে, এখানে কারো জন্য হাতে অস্ত্র নেওয়ারই অনুমতি থাকবে না। والله اعلم

(٢٠٢) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ اَنَّهٗ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَالَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَبَصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهٖ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذَالِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا وَّلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২০২। হযরত আবূ শুরাইহ আদাভী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আমর ইবনে সাঈদকে বলেছিলেন, যখন সে (ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসক ছিল এবং তার নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে) মক্কায় আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করছিল। হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথা আপনার কাছে বর্ণনা করব, যে কথাটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। আমি নিজ কানে এ কথাটি শুনেছিলাম, আমার অন্তর এটা সংরক্ষণ করেছিল এবং তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার দুচোখ তাঁকে দেখছিল। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করলেন। তারপর বললেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত স্থান বানিয়েছেন, মানুষ এটাকে হরম ও সম্মানিত স্থান বানায়নি। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য বৈধ ও হালাল নয় যে, সে এখানে রক্তপাত ঘটাবে অথবা কোন বৃক্ষ নিধন করবে। কেউ যদি আমার লড়াইকে প্রমাণ বানিয়ে এখানে লড়াই করার বৈধতা খুঁজে, তাহলে তোমরা বলে দাও যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আর

আমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা একটি দিনের সামান্য সময়ের জন্য এ অনুমতি দিয়েছিলেন। এ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর হুরমত ও নিষিদ্ধতা ফিরে এসেছে গতকালের মতই। (তাই এখন আর কেয়ামত পর্যন্ত কারো জন্য এর অনুমতি নেই।) তিনি আরো বললেন ঃ উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদেরকে একথা পৌঁছে দেয়। (এজন্যই আমীর সাহেব! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনের জন্য তাঁর এ পয়গাম আপনাকে পৌঁছে দিলাম।)

হযরত আবূ শুরাইহ্কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমর ইবনে সাঈদ (আপনার একথা শুনে) কি উত্তর দিল ? আবূ শুরাইহ্ বললেন, সে উত্তর দিল যে, হে আবূ শুরাইহ্! আমি এ কথাগুলো তোমার চেয়ে বেশী জানি। মক্কার হরম কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না এবং এমন কাউকেও আশ্রয় দেয় না, যে খুনের অপরাধ নিয়ে অথবা ফাসাদ সৃষ্টি করে পালিয়ে এসেছে। (অর্থাৎ, এমন লোকদের বিরুদ্ধে হরম শরীফেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালোভীরা ইসলামের সাথে যে আচরণ করেছে এবং এর বিধানাবলীকে যেভাবে ভেঙ্গে মুচড়ে দিয়েছে, এটা ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট পীড়াদায়ক অধ্যায়। আবূ শুরাইহ্ আদাভী যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন–তিনি উমাইয়া শাসক আমর ইবনে সাঈদের সামনে হক কথা বলে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শুনিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। বুখারী ও মুসলিমের এ রেওয়ায়াতে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, আমর ইবনে সাঈদ যে কথা বলেছিল, এর প্রতিউত্তরে আবূ শুরাইহ্ (রাযিঃ) কিছু বলেছিলেন কিনা। কিন্তু মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন ঃ قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتَ غَائِبًا وَقَدْ اَمَرَنَا اَنْ يُّبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا وَقَدْ بَلَّغْتُكَ অর্থাৎ, ফাত্হে মক্কার দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম, আর তুমি উপস্থিত ছিলে না। আর তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, আমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়। তাই আমি তোমাকে এ কথা পৌঁছে দিলাম।

আবূ শুরাইহ্ আদাভী (রাযিঃ)-এর এ উত্তরের মধ্যে এ বিষয়টিও লুক্কায়িত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝার অধিক হকদার তারাই, যাদের সামনে তিনি একথা বলেছিলেন এবং যারা ঐ সময় তাঁর এ কথা শুনেছিল।

(٢٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ * (رواه الترمذى وابن ماجة)

২০৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আদী ইব্নে হাম্রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হায্ওয়ারা (নামক টিলার) উপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তুমি আল্লাহ্র

ভূমিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি এখান থেকে বের হয়ে যেতে এবং হিজরত করতে বাধ্য না করা হত, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। —তিরমিযী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসে গিয়েছে যে, মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগে সবচেয়ে উত্তম ও আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর স্থান। আর এটাই হওয়া চাই। কেননা, এখানে আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ রয়েছে– যা আল্লাহ্র বিশেষ তাজাল্লীগাহ এবং কেয়ামত পর্যন্ত মু'মিনদের কেবলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যার তাওয়াফ করতেন এবং এ দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস প্রায় একই শব্দমালায় হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

(٢٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْلَاَ اَنْ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ * (رواه الترمذى)

২০৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ তুমি আমার নিকট কতইনা উত্তম ও প্রিয় শহর! আমার কওম যদি আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও বসবাস করতাম না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীসের কোনটিতেই এর উল্লেখ নেই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি কোন্ সময় বলেছিলেন। তবে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি ফাত্হে মক্কার সফর থেকে ফেরার সময় বলেছিলেন। والله اعلم

মদীনা শরীফের মর্যাদা ও ভালবাসা

অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের রীতি এই যে, তারা নিজেদের সংকলনসমূহে হজ্জ ও উমরা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর সাথে 'মক্কার ফযীলত অধ্যায়' শিরোনামে মক্কার মর্যাদা ও ফযীলতের হাদীসসমূহ এবং এরই সাথে 'মদীনার ফযীলত' শিরোনামে মদীনার মর্যাদার হাদীসসমূহ শামিল করে দিয়ে থাকেন। এ রীতির অনুসরণ করতে গিয়ে এখানেও প্রথমে মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো লিখা হয়েছে এবং এখন মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো লিখা হচ্ছে।

(٢٠٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةً * (رواه مسلم)

২০৫। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার নাম 'তাবা' রেখেছেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ তাবা, তায়বা ও তাইয়েবা এ তিনটি শব্দের অর্থ পবিত্র ও সুন্দর। আল্লাহ্ তা'আলা এর এ নাম রেখেছেন এবং এটাকে এমনই বানিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে আত্মার জন্য যে শান্তি, স্বাদ, প্রশান্তি ও পবিত্রতা রয়েছে, এটা কেবল মদীনা শরীফেরই বৈশিষ্ট্য।

(٢٠٦)عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَاِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لاَ يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَّلاَ يُحْمَلَ فِيْهَا سِلاَحٌ وَلاَ يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلاَّ لِعَلَفٍ * (رواه مسلم)

২০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে 'হরম' ঘোষণা করেছিলেন। আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের মাঝের স্থানকে হরম ঘোষণা করছি। এতে রক্তপাত করা যাবে না, কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না এবং পশুদের খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত এর কোন গাছের পাতাও ছিঁড়া যাবে না। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মদীনা তাইয়েবাও সংরক্ষিত সরকারী এলাকার মত অবশ্য সম্মানযোগ্য। সেখানে ঐ সকল কর্ম ও পদক্ষেপ নিষিদ্ধ, যা এর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। তবে এর বিধান ঠিক সেটা নয়, যে বিধান মক্কার হরমের জন্য নির্ধারিত। স্বয়ং এ হাদীসেই এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, এখানে পশুদের খাবারের জন্য গাছের পাতা ছিঁড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অথচ মক্কার হরমে এরও অনুমতি নেই।

(٢٠٧) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُّقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لاَيَدَعُهَا اَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا اِلاَّ اَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ اَحَدٌ عَلَى لاَوَائِهَا وَجَهْدِهَا اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ * (رواه مسلم)

২০৭। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হরম ঘোষণা করছি মদীনার দু'প্রান্তের মধ্যবর্তী এলাকাকে, (আর নির্দেশ দিচ্ছি যে,) এর কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এর শিকারও বধ করা যাবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ (কোন কোন জিনিসের অভাব এবং কোন কোন কষ্ট সত্ত্বেও) মদীনাই মানুষের জন্য উত্তম। তারা যদি এর কল্যাণ ও বরকতের কথা জানত, (তাহলে কোন কষ্ট ও পেরেশানীর কারণে এবং কোন লোভে তারা এটা ছাড়ত না।) যে ব্যক্তি অনীহার ভাব নিয়ে এটা ছেড়ে চলে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে এখানে স্থান দিবেন। আর যে বান্দা মদীনার অনটন ও দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে এখানে পড়ে থাকবে, আমি কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সুপারিশ এর করবেন যে, তার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হোক। আর সাক্ষ্য দিবেন তার ঈমান ও নেক আমলের এবং একথার যে, এ বান্দা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মদীনায়ই পড়ে থেকেছিল।

(২০৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاَوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِىْ اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيمَةِ * (رواه ومسلم)

২০৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি মদীনার অভাব ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সেখানে থেকে যাবে, কেয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী হব। —মুসলিম

(২০৯) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا رَأَوْ اَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاؤُابِهِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اَخَذَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُوْا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَيُعْطِيْهُ ذَالِكَ الثَّمَرَ * (رواه مسلم)

২০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যখন গাছে নতুন ফল দেখত, তখন তারা এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে আসত। তিনি এটা হাতে নিয়ে এভাবে দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফল-ফসলে বরকত দান কর, আমাদের শহর মদীনায় বরকত দান কর, আমাদের ছা' ও আমাদের মুদ্দে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আঃ) তোমার বিশেষ বান্দা, তোমার একান্ত বন্ধু ও তোমার নবী ছিলেন, আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দো'আ করেছিলেন, আর আমি মদীনার জন্য তোমার কাছে ঐ দো'আই করছি। আর এর সাথে আরো এতটুকুই অতিরিক্ত। তার পর তিনি কোন ছোট শিশুকে ডাকতেন এবং এ নতুন ফল তাকে দিয়ে দিতেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ফল-ফসলে বরকত হওয়ার অর্থ তো স্পষ্ট যে, এগুলোর উৎপাদন বেশী হবে। মদীনায় বরকত হওয়ার অর্থ এই যে, এটা খুব আবাদ হবে এবং এর অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ করা হবে। ছা ও মুদ্দ দু'টি ওজন বিশেষ। ঐ যুগে খাদ্য শস্য ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এগুলোই ব্যবহার করা হত। এগুলোর মধ্যে বরকত হওয়ার অর্থ এই যে, এক ছা অথবা এক মুদ্দ জিনিস যতজন মানুষের জন্য অথবা যতদিনের জন্য যথেষ্ট হয়, এর চেয়ে বেশী লোক ও বেশী দিনের জন্য যেন যথেষ্ট হয়ে যায়।

কুরআন মজীদে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঐ দো'আর উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি নিজের স্ত্রী-সন্তানকে মক্কার অনাবাদ ও পানিশূন্য প্রান্তরে রেখে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের অন্তরে তাদের মহব্বত ঢেলে দাও এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় রিযিক ও ফলফলাদি দান কর, আর এখানের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ফায়সালা কর।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্ত হিসাবে ঐ ইব্রাহীমী দো'আর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মদীনার জন্যও ঐ দো'আ; বরং আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিস

যোগ করে দো'আ করতেন। এ দো'আর ফলও স্পষ্ট যে, সারা দুনিয়ার যেসব ঈমানদারদের অন্তরে মক্কার মহব্বত রয়েছে, তাদের সবারই মদীনার মহব্বতও রয়েছে; বরং এ মহব্বত ও ভালবাসায় মদীনার অংশটি নিঃসন্দেহে মক্কার চেয়ে বেশী।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আর মধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর নবী ও বন্ধু বলেছেন, আর নিজেকে কেবল বান্দা ও নবী বলে উল্লেখ করেছেন, বন্ধু হওয়ার কথাটি উল্লেখ করেননি। এ বিনয় ভাব ছিল তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য।

একেবারে নতুন ও গাছের প্রথম ফলটি ছোট শিশুদেরকে ডেকে দেওয়ার মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে ছোট মাসূম বাচ্চাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া চাই। তাছাড়া নতুন ফল ও ছোট শিশুদের সম্বন্ধটিও প্রকাশ্য।

(٢١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِي الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ * (رواه مسلم)

২১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত আসবে না, যে পর্যন্ত না মদীনা তার মন্দ লোকদেরকে এভাবে দূর করে দেবে, যেভাবে কামারের হাঁপর লোহার ময়লা ও খাদকে দূর করে দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, কেয়ামত আসার আগে মদীনার জনপদকে এমন মন্দ লোকদের থেকে পাক-পবিত্র করে নেয়া হবে, যারা আকীদা -বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও আমল আখলাকের দিক দিয়ে অপবিত্র হবে।

(٢١١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ * (رواه البخارى ومسلم)

২১১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনার পথসমূহে ফেরেশ্‌তারা নিয়োজিত রয়েছে। এতে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিমেরই অপর কোন কোন বর্ণনায় মদীনার সাথে মক্কারও এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাজ্জাল সেখানেও প্রবেশ করতে পারবে না। এটা সম্ভবত ঐ দো'আসমূহের বরকত, যা আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি পবিত্র ও বরকতময় শহরের জন্য করেছিলেন।

(٢١٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا * (رواه احمد والترمذى)

২১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব, সে যেন (এর চেষ্টা করে এবং)

মদীনায়ই মরে। কেননা, যে ব্যক্তি মদীনায় মারা যায়, আমি তার জন্য (বিশেষভাবে) শাফা'আত করব। —আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা স্পষ্ট যে, আমার মৃত্যু অমুক স্থানে আসুক, এটা কারো এখতিয়ার ও ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। তবে মানুষ এর আকাঙ্ক্ষা ও এর জন্য দো'আ করতে পারে এবং কোন না কোন পর্যায়ে এর চেষ্টাও করতে পারে। যেমন, যেখানে মরতে চায়, সেখানে গিয়ে পড়ে থাকবে। যদি তকদীরের ফায়সালা বিপরীত না হয়, তাহলে মৃত্যু সেখানেই আসবে। যাহোক, হাদীসটির উদ্দেশ্য এটাই যে, যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করতে চায়, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যারা এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের সাহায্য করেন।

(٢١٣) عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِى الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اُرِدْ هٰذَا اِنَّمَا اَرَدْتُ الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لاَ مِثْلَ الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقْعَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَكُوْنَ قَبْرِىْ فِيْهَا مِنْهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ * (رواه مالك مرسلا)

২১৩। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী তাবেয়ী থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার কবরস্তানের পাশে) বসা ছিলেন এবং এ সময় একটি কবর খোঁড়া হচ্ছিল। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি দিয়ে দেখল এবং বলে ফেলল, মু'মিনের জন্য এটা কতইনা মন্দ স্থান! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কী মন্দ কথাইনা বললে! (একজন মুসলমানের মদীনায় মৃত্যু এসেছে আর এখানেই তার কবর হয়েছে, আর তুমি বলছ যে, মুসলমানের জন্য এ শয়নস্থল ভাল নয়) লোকটি বলল, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়; (যে, মদীনায় মৃত্যু ও কবর হওয়া ভাল নয়) বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র রাহে শহীদী মৃত্যু। (অর্থাৎ, আমি এটা বলতে চেয়েছিলাম যে, এ লোকটি বিছানায় পড়ে মরে ও এ স্থানে দাফন হওয়ার পরিবর্তে যদি কোন জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যেত এবং তার রক্তমাখা লাশ সেখানে পড়ে থাকত, তাহলে এ কবরে দাফন হওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভাল হত।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ এ মৃত্যু আল্লাহ্র রাহে শহীদী মৃত্যুর সমান তো নয়, (অর্থাৎ, শাহাদতের মর্তবা তো অনেক উচ্চে, কিন্তু মদীনায় মৃত্যুবরণ করা এবং এ মাটিতে দাফন হওয়াও বিরাট সৌভাগ্য।) আল্লাহ্র যমীনে এমন কোন স্থান নেই যেখানে আমার কবর হওয়া মদীনা অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। —মুয়াত্তা মালেক

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার মর্ম বাহ্যত এই যে, আল্লাহ্র পথে শাহাদত লাভের ফযীলত ও মাহাত্ম্য অবশ্যই স্বীকৃত এবং বিছানায় পড়ে মরা ও জেহাদের ময়দানে আল্লাহ্র জন্য জীবন উৎসর্গ করা সমান নয়; কিন্তু মদীনায় মৃত্যুবরণ করা ও এখানে কবরস্থ হওয়াও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আমি নিজেও এর আকাঙ্ক্ষা করি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজ কিতাব বুখারী শরীফের কিতাবুল হজ্জের একেবারে শেষে মদীনা শরীফের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর এর সমাপ্তি টেনেছেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর এ প্রসিদ্ধ দো'আর উপর ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার পথে শহীদ হওয়ার মর্যাদাও দান কর এবং তোমার রাসূলের শহর মদীনায় আমার মৃত্যু নছীব কর।

এ দো'আর ঘটনা ইবনে সা'দ বিশুদ্ধ সনদে এ বর্ণনা করেছেন যে, আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী স্বপ্ন দেখলেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)-কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি এ স্বপ্নের কথা হযরত ওমরকে বললেন। হযরত ওমর তখন খুব আক্ষেপের সাথে বললেন ঃ اَنّٰى لِىْ بِالشَّهَادَةِ وَاَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ لَسْتُ اَغْزُوْ وَالنَّاسُ حَوْلِىْ অর্থাৎ, আমি শাহাদত কিভাবে লাভ করব, অথচ আমি জাযীরাতুল আরবে অবস্থান করছি (আর এসব দারুল ইসলাম হয়ে গিয়েছে।) আমি নিজে জেহাদ করি না আর সবসময়ই আমার আশপাশে লোকজন থাকে। তারপর নিজেই বললেন, يَاْتِىْ بِهَا اللّٰهُ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ, আমার শাহাদত কেন নছীব হবে না ? আল্লাহ্ যদি চান, তাহলে এসব অবস্থার মধ্যেও তিনি আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করবেন। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ দো'আটি করলেন– যা উপরে লিখে আসা হয়েছে ঃ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

হযরত ওমরের মুখে একথা শুনে তাঁর কন্যা হযরত হাফছা বললেন, এটা কিভাবে হতে পারে যে, আপনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদও হবেন, আবার আপনার মৃত্যুও মদীনায় হবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে এ দু'টিই আমার ভাগ্যে জুটবে।

এ ধারার রেওয়ায়তগুলোতে এ কথাও এসেছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর এ আশ্চর্য বরং বাহ্যত অসম্ভব দো'আর কারণে মানুষ আশ্চর্যবোধ করত এবং কারো বুঝেই আসত না যে, দুটি বিষয়ই কেমন করে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যখন আবূ লু'লু মজুসী মসজিদে নববীর মেহরাবে তাঁকে আহত করে ফেলল, তখন সবাই বুঝতে পারল যে, দো'আটি এভাবে কবূল হওয়ার ছিল।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন ঐ জিনিস সংঘটিত করে দেখান, যার সম্ভাবনার ব্যাপারেও মানুষের জ্ঞান সন্দেহ করে। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

মসজিদে নববীর মাহাত্ম্য ও ফযীলত

মসজিদে নববী– হিজরতের পর মদীনা তৈয়্যেবায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ভিত্তি রেখেছেন, তারপর যেখানে জীবনভর নামায পড়েছেন এবং যা তাঁর সারা জীবনের সকল দ্বীনি কর্মকান্ড, শিক্ষা-দীক্ষা, হেদায়াত ও পথপ্রদর্শন, দাওয়াত ও জেহাদের কেন্দ্র ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে তাঁর পবিত্র ঘর খানায়ে কা'বা ও মসজিদুল হারাম ছাড়া সকল এবাদতগাহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, এ মসজিদে নববীর একটি নামায সাধারণ অন্য মসজিদের হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম।

(٢١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * (رواه البخارى ومسلم)

২১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এ মসজিদে একটি নামায অন্যান্য সকল মসজিদের হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম মসজিদুল হারাম ব্যতীত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মসজিদে নববীর নামাযকে মক্কার মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য সাধারণ মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদুল হারামের নামাযের কি মর্তবা, সে ব্যাপারে এ হাদীসে কোন উল্লেখ নেই। তবে সামনের হাদীসে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

(٢١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلٰوةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِأَةِ صَلٰوةٍ فِيْ هٰذَا * (رواه احمد)

২১৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এ মসজিদের একটি নামায অন্যান্য মসজিদের হাজার নামায থেকে উত্তম– মসজিদুল হারাম ব্যতীত। আর মসজিদুল হারামের একটি নামায আমার এ মসজিদের একশ নামাযের চেয়ে উত্তম। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দুনিয়ার অন্য যে কোন মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে নামায পড়ার সওয়াব এক হাজার গুণ; বরং এর চেয়েও কিছুটা বেশী। আর মসজিদুল হারামের নামায মসজিদে নববীর নামায থেকেও একশ গুণ উত্তম। অর্থাৎ, সাধারণ মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামে নামাযের সওয়াব এক লক্ষ গুণ; বরং এর চাইতেও কিছুটা বেশী।

(٢١٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فِيْ مَسْجِدِيْ اَرْبَعِيْنَ صَلٰوةً لاَ تَفُوْتُهٗ صَلٰوةٌ كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ * (رواه احمد والطبرانى في الاوسط)

২১৬। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে একাধারে এমনভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ল যে, তার একটি নামাযও ছুটে যায়নি, তার জন্য তিনটি জিনিস থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেওয়া হবে ঃ (১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি, (২) সব ধরনের আযাব থেকে মুক্তি, (৩) নেফাক থেকে মুক্তি। —আহমাদ, তাবারানী

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন আমল আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিশেষ মকবূলিয়্যত পাওয়া ও পছন্দনীয় হওয়ার কারণে বিরাট বিরাট ফায়সালার কারণ হয়ে যায়। এ হাদীসে মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করার উপর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্র ফরমান ঘোষিত হয়ে যাবে যে, এ বান্দা নেফাকের অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, জাহান্নাম ও সর্বপ্রকার আযাব থেকে সে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে।

(٢١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ * (رواه البخارى ومسلم)

২১৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝের স্থানটি বেহেশতের বাগান বিশেষ। আর আমার মিম্বরটি আমার হাউযে কাওছারের উপর। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদে নববীর যে স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বর ছিল, যাতে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন, (যে স্থানটি এখনও সুপরিচিত।) এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মিম্বরের এ জায়গা ও হুজরা শরীফের মাঝে যে জায়গাটি রয়েছে, এটি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণের বিশেষ স্থান, আর এ কারণে এটা যেন বেহেশতের একটি বাগান। এ জন্য এটা এর দাবীদার যে, আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাত প্রত্যাশীদের এর প্রতি জান্নাতের মতই আকর্ষণ থাকবে। আর এ অর্থও করা যায় যে, আল্লাহ্র যে বান্দা ঈমান ও এখলাছের সাথে আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাতের প্রত্যাশা নিয়ে এ জায়গায় এসেছে, সে যেন জান্নাতের একটি বাগানে এসে গিয়েছে এবং আখেরাতে সে নিজেকে জান্নাতের একটি বাগানেই দেখতে পাবে।

হাদীসটির শেষে তিনি বলেছেন, "আমার মিম্বরটি আমার হাউযের উপর।" এর অর্থ বাহ্যত এই যে, আখেরাতে হাউযে কাওছারের উপর আমার একটি মিম্বর থাকবে। আর আমি যেভাবে এ দুনিয়ায় এ মিম্বর থেকে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর হেদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়ে থাকি, তেমনিভাবে হাউযে কাওছারে স্থাপিত আমার ঐ মিম্বর থেকে হেদায়াত গ্রহণকারী বান্দাদেরকে রহমতের পানি পান করাব। অতএব, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আবে কাওছারের প্রত্যাশী হয়ে আছে, সে যেন অগ্রসর হয়ে এ মিম্বর থেকে প্রদত্ত হেদায়াতের পয়গাম কবূল করে নেয় এবং এটাকে নিজের আত্মিক খোরাক বানিয়ে নেয়।

(٢١٨) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا * (رواه البخارى ومسلم)

২১৮। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতে কেবল তিনটি মসজিদ রয়েছে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে যেন সফর করে যাওয়া না হয়। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) ও আমার এ মসজিদ। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ তিনটি মসজিদেরই রয়েছে যে, এগুলোতে আল্লাহ্র এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয; বরং আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের কারণ। এগুলো ছাড়া অন্য কোন মসজিদের এ মর্তবা ও বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এগুলোর জন্য সফর করার নিষিদ্ধতা রয়েছে।

একথাও সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটির সম্পর্ক কেবল মসজিদের সাথে, আর নিঃসন্দেহে এ হাদীসের আলোকে মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা ছাড়া পৃথিবীর অন্য যে কোন মসজিদে এবাদতের জন্য সফর করা নিষেধ। কিন্তু অন্যান্য বৈধ পার্থিব ও দ্বীনি

উদ্দেশ্য যেমন ব্যবসা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, পুণ্যবানদের সাহচর্য লাভ এবং তাবলীগ ও দাওয়াত ইত্যাদির জন্য সফর করার সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই।

রওযা শরীফের যিয়ারত

যদিও রওযা শরীফের যিয়ারত হজ্জের কোন অঙ্গ নয়; কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে উম্মতের এ অভ্যাস ও রীতি চলে আসছে যে, বিশেষ করে দূর অঞ্চল থেকে যেসব মুসলমান হজ্জ করতে যায়, তারা রওযা শরীফের যিয়ারত ও সেখানে দরূদ ও সালাম পেশ করার সৌভাগ্যও অবশ্যই অর্জন করে থাকে। এ জন্যই হাদীসের অনেক সংকলনে কিতাবুল হজ্জের শেষে যিয়ারতে নববীর হাদীসসমূহও লিখে দেয়া হয়েছে। এ নীতির অনুসরণ করতে গিয়েই কিতাবুল হজ্জের এ ধারাবাহিক আলোচনাটি আমরা যিয়ারতে নববীর হাদীসসমূহের মাধ্যমেই শেষ করছি।

(٢١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان والطبرانى فى الكبير والاوسط)

২১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার কবর যিয়ারত করল আমার মৃত্যুর পর, সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল। —বায়হাকী, তাবারানী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিজ কবরে; বরং সমস্ত নবী-রাসূলই যে নিজ নিজ আলোকিত কবরে জীবিত রয়েছেন, এটা জমহুরে উম্মতের স্বীকৃত মত– যদিও এ জীবনের ধরন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা ও উম্মতের বিশেষ মনীষীদের অভিজ্ঞতার দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি যখন রওযা শরীফে হাজির হয়ে সালাম নিবেদন করে, তখন তিনি তার সালাম শুনেন এবং উত্তরও দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর রওযা শরীফে হাজির হওয়া ও সালাম নিবেদন করা যেন এক বিবেচনায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া ও সামনাসামনি সালাম করারই একটি রূপ। নিঃসন্দেহে এটা এমন সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঈমানদার বান্দারা যে কোন মূল্যে এটা অর্জন করার চেষ্টা করবে।

(٢٢٠) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ * (رواه ابن خزيمة فى صحيحه والدار قطنى والبيهقى)

২২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল। —ইবনে খুযায়মা, দারাকুতনী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'মা'আরিফুল হাদীস' সিরিজের প্রথম খন্ডে ঐসব হাদীস লিখে আসা হয়েছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত একজন উম্মতের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া দুনিয়াতে সকল জিনিস থেকে এমনকি নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং স্বয়ং নিজের জীবনের চেয়ে অধিক না হবে, সে পর্যন্ত সে ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও স্বাদ লাভ করতে পারবে না। রওযা শরীফের যিয়ারত নিঃসন্দেহে এ

ভালবাসারই একটি অনিবার্য দাবী। আর এটা যেন এরই এক বাস্তব নমুনা। আরবী কবি বলেন ঃ

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلِى * أُقَبِّلُ ذَاالْجِدَارِ وَذَاالْجِدَارِ

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِى * وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

অর্থাৎ, আমি যখন লায়লার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাই, তখন কখনো এ দেয়ালে চুমু খাই আর কখনো ঐ দেয়ালে। কিন্তু এ ঘরের ভালবাসা আমার অন্তরকে পাগল বানায়নি; বরং এ ঘরে যে বাস করে তার ভালবাসাই আমাকে এমন বানিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া যিয়ারতের সময় যিয়ারতকারীর অন্তরে যে ঈমানী আবেগ সৃষ্টি হয় এবং নবীর সান্নিধ্যে আসার বরকতে ঈমানী প্রতিজ্ঞার নবায়ন, গুনাহর জন্য অনুতাপ, আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ ও তওবা এস্তেগফারের যে ঢেউ তার অন্তরে জাগে, এর সাথে নবীর ভালবাসার যে আবেগ দোলায়িত হয় এবং ভালবাসা ও অনুতাপ মিশ্রিত অনুভূতি তার চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরিয়ে দেয়, এগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি জিনিসই এমন, যা নবীর শাফাআত; বরং আল্লাহ্র ক্ষমাকেও অনিবার্য করে দেয়। এজন্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রওযা শরীফ যিয়ারতকারী প্রতিটি ঈমানদারের ভাগ্যেই নবীর শাফাআত নছীব হবে। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন যিয়ারতকারী যদি এমন হয় যে, তার অন্তরে এ ধরনের কোন আবেগ, অনুভূতি ও অবস্থাই সৃষ্টি না হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তার অন্তর ঈমানের মূল চেতনা থেকে শূন্য। তাই তার যিয়ারত প্রকৃত যিয়ারত নয়; বরং শুধু যিয়ারতের আকৃতি ও রূপ। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট কোন আমলেরই কেবল বাহ্যিকরূপ গ্রহণযোগ্য নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের যেসব উপকারিতা, বরকত ও কল্যাণের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সামনে রেখে যদি ঐসব হাদীসের চিন্তা করা হয়, যেগুলো এ যিয়ারতের প্রতি উৎসাহদানে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে যদিও সনদের দিক দিয়ে এগুলোর উপর কথা বলা যেতে পারে; কিন্তু বিষয়গত দিক দিয়ে এগুলো দ্বীনি চিন্তা-চেতনা ও কর্মনীতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল মনে হবে এবং সুস্থ মস্তিষ্ক এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে যে, কবর মুবারকের এ যিয়ারত আসলে কবরে শায়িত মহান সত্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক, তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং দ্বীনি উন্নতির বিশেষ ওসীলা। আমাদের বিশ্বাস, প্রতিটি ভাগ্যবান ঈমানদার বান্দা– যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এ যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করেছেন– এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

রওযা শরীফ যিয়ারতের বিস্তারিত আদাব ও নিয়ম এ অধম তার রচিত "আপ কেয়সে হজ্জ করেঁ" নামক কিতাবে লিখে দিয়েছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এটা অবশ্যই দেখে নেন। ইনশাআল্লাহ্ ঈমানী স্বাদ পাবেন।

মা'আরিফুল হাদীস (চতুর্থ খন্ড) যিয়ারতে নববীর এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শেষ হল।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَعَلٰى رَسُوْلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ